সৎপ্রসঙ্গ।

—•—

ত্রিতাপে তাপিত প্রাণ—যদি শান্তি চাও।
সৎপ্রসঙ্গে সাধুসঙ্গে জীবন কাটাও॥

—•—

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী
প্রণীত।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, প্রকাশক,
"পৃথিবীর ইতিহাস" কার্য্যালয়, হাওড়া।

Printed and Published by
DHIRENDRANATH LAHIRI.
"Prithibir Itihasha" Printing Works,
2, Annodaprosad Banerji's Lane, Khirertala.
HOWRAH. (*Calcutta*)

আবাহন।

সং পূষন্নধ্বনস্তির ব্যংহো বিমুচো নপাৎ।

সক্ষ্বা দেব প্রণস্পুর॥

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।

অপ স্ম তং পথো জহি।

ঋগ্বেদ, ১ম—৪২শ সূঃ।

যে মন্ত্রে ঋষিগণ আহ্বান করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রেই আহ্বান করিতেছি। হে জগজ্জীবন জ্যোতির্ম্ময়! বিঘ্ন বিনাশ করুন; গন্তব্য-পথ প্রদর্শন করুন; আমাদিগের নেতৃরূপে অগ্রে অগ্রে পথ-প্রদর্শক-রূপে অগ্রসর হউন।

উদ্বোধন।

ভগবৎ-মাহাত্ম্য।

বিচিত্র-পদাবলি-সমলঙ্কৃত হইলেও সে সাহিত্য সাহিত্যই নহে—যদি তাহাতে ভগবৎ-তত্ত্বের আলোচনা না থাকে। শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন,—'অতি-বিচিত্র পদবিন্যাস সত্ত্বেও যে বাক্যের কোনও স্থানে শ্রীহরির জগৎ-পাবন যশ কীর্ত্তিত হয় নাই, সুধিজনগণ তাহাকে কাক-তীর্থ-

স্বরূপ—কাকতুল্য কামিগণের বিহারস্থান—বলিয়া মনে করেন। কমনীয়-পদ্ম-ষণ্ডনিবাসী মানস-সরোবর-বিহারী রাজহংসের ন্যায়, কমনীয়-ব্রহ্মানন্দ-বিলাসী সত্ত্বপ্রধান-চেতা পরমহংসগণ কদাপি উহাতে নিরত হয়েন না। অর্থাৎ,—সুনির্ম্মল-মানস-সরোবর-বিহারী রাজহংসগণ যেমন বায়সসেবিত পরিত্যক্ত-বিচিত্র-অন্নাদি-যুক্ত উচ্ছিষ্ট গর্ত্তাদি পরিত্যাগ করিয়া কমলবনেই বিহার করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণাবলম্বী সাধুগণও সেইরূপ বিচিত্র-পদালঙ্কৃত হইলেও হরিকথাবিহীন বাক্যে কদাপি মনোভিনিবেশ করেন না; তাঁহারা সুপবিত্র হরিকথামৃত-পানেই নিয়ত নিরত থাকেন।' শ্রীমদ্ভাগবতে এই উক্তিই দৃষ্ট হয়;—

"ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিত।
তদ্বায়সং তীর্থমুশন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্ত্যশিক্ষয়াঃ॥"

পক্ষান্তরে আবার লিখিত আছে,—'সেই সাহিত্যই সাহিত্য—যে সাহিত্যে ভগবানের পরিচয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। অপশব্দাদিযুক্ত হইলেও সে সাহিত্যে জনসাধারণের পাপরাশি নাশ করিয়া থাকে। সাধুগণ সেই সাহিত্যেরই সমাদর করিয়া থাকেন।' সেই সাহিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্র পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন,—

"তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥"

শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহ যে সর্ব্বথা সম্পূজিত, তাহার প্রধান কারণ—শাস্ত্রগ্রন্থ-সমূহে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব পরিবর্ণিত আছে,—ভগবানের নাম-গান পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শত ত্রুটি-বিচ্যুতি-সত্ত্বেও 'সৎপ্রসঙ্গের' সার্থকতা—ভগবৎগুণানুকীর্ত্তনে।

——*——

সৎপ্রসঙ্গ।

সূচী।

উপহার।

আমাদের বংশের গৌরব-স্থানীয়

আমাদের অকৃত্রিম সুহৃৎ

মাতৃভাষানুরাগী

ধর্ম্মপ্রাণ

রাজসাহী কাশিমপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী

মহোদয়কে

আমার আন্তরিক

প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন-স্বরূপ

সৎপ্রসঙ্গ।

উপহার প্রদান করিলাম।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

২০শে আশ্বিন, ১৩২২ সাল।

সৎপ্রসঙ্গ।

—*‡*‡*—

দয়াময়! দয়া কর।

তিনি কি বধির?

ভগবান কি বধির? বিপদ-সাগরে পড়িয়া কাতর-কণ্ঠে ডাকিয়া যখন তাঁহার কোনই উদ্দেশ না পায়; মানুষ তখন মনে করে—ভগবান্ কি বধির? অথবা, তিনি শুনিয়াও শুনেন না?

* * *

সমস্যা।

কাহারও প্রাণপাত প্রার্থনাও তাঁহার কর্ণে পৌছে না, আবার কেহ একবার মাত্র ডাকিয়াই অভীপ্সিত ফল-লাভ করে;—এ কি উদ্ভট সমস্যা? প্রার্থনার কোনও নিয়ম তো কেহ এ পর্য্যন্ত কিছু আবিষ্কার করিতে পারিল না! তবে এ কি রহস্য?

কর্ম্মফল।

এ কি কর্ম্মফল? ইহজন্মের—না পূর্ব্বজন্মের? সকলই অন্ধতমসাবৃত। শত নারকীয় চরিত্র সংসারে প্রতিষ্ঠাপন্ন দেখিতে পাই, আবার কত সাধু-সজ্জনের দুর্দ্দশার অবধি নাই! এ সব কি? কে বুঝাইবে—কিরূপে বুঝিব—জন্মান্তরীণ কর্ম্মরহস্য? জগদীশ্বর!—একবার জ্ঞাননেত্র উন্মোচন করিয়া দেও—একবার স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেও—অন্ধ-জীব তরিয়া যাউক। দয়াময়!—দয়া কর!

—— * ——

কত জন্মে?

অন্ধের ন্যায়।

চিরজীবন কি অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া মরিব? স্বরূপতত্ত্ব আমাদিগকে কে বুঝাইয়া দিবে? তাঁহার সমীপস্থ হইবার সুগম পন্থা কিরূপে দেখিব?—কে দেখাইয়া দিবে?

* * *

মরীচিকায়।

তৃষাতুর মৃগ, জল-ভ্রমে মরীচিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া, প্রাণান্ত হয়। কত কোটী-কল্প কাল হইতে কত অনন্ত কোটী মৃগ, এইরূপে ছুটিয়া ছুটিয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু এখনও উহার স্বরূপ-তত্ত্ব কিছু উপলব্ধি করিতে পারিল না। জানি না—কখনও পারিবে কি না!

* * *

এখনও কতদূরে?

মানুষও সেইরূপ ছুটিয়া ছুটিয়া মরিতেছে। এ জন্মে না হয়, পরজন্মে মিলিবে; পরজন্মে না হয়, তার পরেও মিলিবে,—এই আশার ডোরে হৃদয় বাঁধিয়া মানুষ সদা মরিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। কিন্তু মিলিল কৈ?

সে আরাধ্যধন—সে যোগিধ্যেয় জগজ্জীবন—তিনি এখনও কত দূরে? কত দিনে—কত জন্মে—কত মরণের পরে—তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে, কেহ বলিয়া দিতে পার কি?

—— * ——

স্বরূপ-তত্ত্ব।

সাকার নিরাকার?

সাকার কি নিরাকার? পৃথিবীর জন্মদিবস হইতেই তর্ক-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে,—ঈশ্বর—সাকার কি নিরাকার? কেবল তর্কই চলিয়াছে; কিন্তু কেহ কোনও পথেই তাঁহার অনুসরণ করিতেছি না।

* * *

সাকার।

জগদীশ্বর জীবের দৃশ্যমান্ নহেন; সেই হেতুই কি তাঁহার সাকারত্বে সংশয়ান্বিত হওয়া সমীচীন? সাকার মাত্রই কি চক্ষুরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত? সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম অণুপরমাণুর প্রসঙ্গ উত্থাপন নাই করিলাম; কিন্তু প্রাণি-জগতেও চক্ষুরগোচর যাহাদিগের অস্তিত্ব আজি প্রমাণিত, তাহাদের সম্বন্ধে কি কহিব? তাহারা—সাকার কি নিরাকার? কি বলিব?

* * *

সাকারে নিদর্শন।

সকলের দৃশ্যমান্ নহেন বলিয়াই ঈশ্বরের সাকারত্ব উড়াইয়া দিতে পারি না। হয় তো বাঙ্গালার দূর-প্রান্তের অনেক লোক, ভারতের বড়লাটকে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু দেখেন নাই বলিয়াই যে বড়লাটের অস্তিত্ব নাই, ইহা কি কেহ কহিতে পারেন? ভারতের সম্রাট্ ইংলণ্ডের অধীশ্বরকে আমরা দেখি নাই; দেখি নাই

কিন্তু তিনি একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে বিদ্যমান্। অতএব, চক্ষুরগোচর হইলেও, সাকারত্বে সংশয় থাকিতে পারে না।

* * *

অনুসরণে। সাকার নিরাকার নামভেদ মাত্র। তিনি যেমন সাকাররূপে প্রতিপন্ন, তাঁহার নিরাকারত্বও তেমনই উপলব্ধ। দেশভেদে সমাজভেদে সংজ্ঞা বহু; সংসারী একভাবে তাঁহাকে দেখেন, সন্ন্যাসী আর এক ভাবে তাঁহার অনুসরণ করেন। সকলেরই লক্ষ্য তিনি। যেমন,—দেশ-দেশান্তর হইতে বহু যাত্রী কাশীধামে মণিকর্ণিকায় যোগস্নান করিতে চলিয়াছেন; কেহ উত্তর দিক হইতে আসিতেছেন; কেহ বা পূর্ব্ব, দক্ষিণ, কেহ বা পশ্চিম হইতে আসিতেছেন; কেহ নৌকাযোগে চলিয়াছেন; কেহ গো-যানে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা বাষ্পীয় শকটে। মূল লক্ষ্য কিন্তু সকলেরই মণিকর্ণিকায় যোগস্নান। ভগবৎ অনুসরণেও সংসারের সেই দৃশ্য। যিনি যে পথেই চলিয়াছেন, চলিতে দেও; বৃথা তর্কতরঙ্গ তুলিয়া প্রতিনিবৃত্ত কর কেন? অগ্রসর হইতে দেও—অগ্রসর হইতে দেও। কেবল দেখিও,—কেহ যেন কখনও কোনরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই।

* * *

সার শিক্ষা।

নৈরাশ্যে। নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রামে মানুষ যখন পরাজিত হয়, তাহার কৃতিত্বের মানদণ্ড যখন কৃতকার্য্যতার গভীরতা নিরূপণে অক্ষম হইয়া পড়ে, মানুষের শেষ ভরসা তখন ভগবানে অর্পিত হয়।

কর্ম্মে নৈরাশ্য।

কিন্তু কোনও সংগ্রামের আবশ্যক হয় না,; কোনরূপ পরাজয়ের ভয় থাকে না, অকৃত-কার্য্যতা নিবন্ধনও কোনরূপ নৈরাশ্যে মুহ্যমান্ হইতে হয় না,—যদি কর্ম্মের প্রারম্ভ হইতে ফলাশায় ব্যাকুল না হই। শ্রীভগবানের প্রধান উপদেশ তাই—'ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম কর'। মনে কর,—কর্ম্ম তাঁহারই।

* * *

সার কর্ম্ম।

শ্রীভগবৎপাদপ্রান্তে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, তাঁহারই সৃষ্টির—তাঁহারই সংসারের—মঙ্গল-কামনায় অনুপ্রাণিত হইয়া, তাঁহারই উপর কর্ম্মফল ন্যস্ত রাখিয়া, যদি কর্ম্ম করিতে পারি; নৈরাশ্যের কোনও কষ্ট সহিতে হয় না, অসন্তোষের বিষ-বীজ অন্তরক্ষেত্রে আদৌ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, সিদ্ধিলাভ নিরুদ্বেগেই সুসম্পন্ন হয়। 'গীতা' 'গীতা' বলিয়া আজিকালি আন্দোলন দেখিতে পাই। কিন্তু গীতার এই সার-শিক্ষা—শ্রেষ্ঠ-উপদেশ—কত দিনে পালন করিতে শিখিব?—কত দিনে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জন করিতে পারিব?

—— * ——

জ্যোতিঃস্বরূপ।

পরিণতি।

সকল সৃষ্ট-সামগ্রীর শেষ পরিণতি এক। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া যাইলে, সকলেরই শেষ দাঁড়ায় এক। স্থূল দৃষ্টিতেই যেমন দেখি, এত যত্নের এই অমূল্য দেহের শেষ পরিণতি—জল মৃত্তিকা ইত্যাদি; সকল সামগ্রীরই শেষ সেইরূপ—একে।

* * *

আদ্যন্ত।

স্থূল দৃষ্টিতে যাহা দেখি—জল-মৃত্তিকা, আরও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহাই আবার জ্যোতিঃ-রূপে প্রতিভাত। দেখিতে দেখিতে, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিতে করিতে শেষ জ্যোতিঃ-স্বরূপই জগতের মূলীভূত বলিয়া প্রতিপন্ন হন। জ্যোতিঃই আদি, জ্যোতিঃই অন্ত। সৃষ্ট-জগৎ সেই জ্যোতিঃর মাঝে ভাসিতেছে। তাই তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ।

—— * ——

মানুষের বিভ্রম।

ঈশ্বর বিব্রত।

কল্পনা ও যুক্তি, ঈশ্বর বেচারাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার নিত্য-নূতন কত রূপের ছটা জাহির হইতেছে, নিত্যানিত্য কত গুণের আরোপ তাঁহার উপর চলিয়াছে।

* * *

কত কল্পনা!

শ্বেত-কৃষ্ণ পীত-নীল হরিৎ-শ্যামল—কতই না তাঁহার রঙের কল্পনা! প্রস্তরে-মৃত্তিকায় খড়ে-কাঠে কতই না তাঁহার অঙ্গ-বৈচিত্র্য! ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ, ব্যাধি, শান্তি—এক এক গুণের এক এক অভিব্যক্তি! জগতে যত কল্পনা ও যত যুক্তি হইতে পারে, সকল কল্পনায়—সকল যুক্তিতেই তাঁহাকে লইয়া টানাটানি!

* * *

গড্ডলিকা।

মানুষ গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ চলিয়াছে। যে কল্পনায় যে যুক্তিতে যিনি পরাভূত হইতে-ছেন, তিনিই তাহার অনুগমন করিতেছেন। কেহই কিছু বুঝিতে পারিতেছে না বা বুঝিবার চেষ্টাও পাইতেছে না যে,

স্বরূপ-পক্ষে তিনি কি? বুঝিতেছে না যে, তিনি যাহা তাহাই আছেন। মানুষ কেবল ঘুরিয়া মরিতেছে।

—— * ——

স্বরূপ-জ্ঞান।

মূল এক।

মূল সেই এক। তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিলেও শেষ গিয়া দাঁড়ায়—মূল সেই এক। সৃষ্ট-সামগ্রীর প্রকার-ভেদ আকার-ভেদ নাম-ভেদ যতই কেন প্রত্যক্ষ করি না, সকলেরই মূল সেই এক—এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। তাই তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

* * *

স্থূল দৃষ্টান্ত।

সুন্দর অট্টালিকা। ইট, কাঠ, চুণ, সুরকী, রঙ, মাটী—কত অভিনব সামগ্রীর সমাবেশে নির্ম্মিত সুন্দর অট্টালিকা। দেখিতে, কত সুদৃশ্য—কত সুরম্য। কিন্তু মূল উহার কি? স্থূল ভাবেই তো দেখিতে পাই—জল মৃত্তিকা কর্দ্দম উহার মূল, তাহাতেই আবার উহার পরিণতি।

* * *

পরিণতি।

এমন যে নবনীত-কোমল সুঠাম নরদেহ, উহারই বা মূল পদার্থ কি? এই হাত, এই মুখ, এই চোক, এই ত্বক, এই জিহ্বা—কত-না নাম-রূপের সামগ্রী-যোগে এই নরদেহ বিগঠিত হইয়াছে। কিন্তু মূল সেই এক। সেই জল, সেই মাটী, সেই বায়ু, সেই তেজ, সেই আকাশ। পঞ্চভূতাত্মক দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, পঞ্চভূতেই উহার অবসান। সংসারের সকল সামগ্রীরই এই পরিণতি। এ পরিণতি নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত।

স্বরূপ সামগ্রী।

স্থূল দৃষ্টিতেই এই দেখি। আরও একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকিলে, পঞ্চভূত শেষে একরূপে মিশিয়া যায়। সেই এক যিনি, অণুর অণু পরমাণুর পরমাণু যিনি, আবার একত্বে বিশালত্বে জগৎজোড়া যাঁহার আকৃতি-স্থিতি, ঈশ্বর জগদীশ্বর তাঁহারই অনন্ত নাম কল্পনা করিয়া থাকি। স্বরূপ-জ্ঞান জন্মিলে, সাধক আর তখন নাম লইয়া বিতণ্ডা করেন না; তিনি তখন সেই স্বরূপ সামগ্রীর অনুসরণ করিয়া থাকেন,—মূল বস্তুর সন্ধান করেন।

***

মা!—মা!

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতঃ তদেব তব পূজনম্॥"

কি যেন হারাইয়াছে!

বর্ত্তমান, উন্নতির পথে আগুয়ান। বিজ্ঞান, অজ্ঞান করিয়া দিয়াছে। শিল্প-চাতুর্য্য, কত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে। মানুষের কল্পনায় দেবতার সাধনায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। নবযুগ, অসাধ্য সাধন করিতে শিখিয়াছে। সব হইয়াছে; কিন্তু একটি হারাইয়াছে। মানুষ, সুন্দর সুঠাম অনুপাম দেবমূর্ত্তি গড়িতে শিখিয়াছে; কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্রটুকু ভুলিয়া গিয়াছে। মানুষ যতই অগ্রসর হইতেছে, অতীতের অতি দূরে সে মন্ত্র ফেলিয়া যাইতেছে। প্রথমে বুঝিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরিশেষে পরিতাপের তুষানলে দগ্ধ হইতেছে। সংসারে শান্তি নাই। সংসার আধিব্যাধি-শোকতাপে সদাই জর্জ্জরীভূত। কোথাও দুর্ভিক্ষের দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুদগমে দেশ ডুবিয়া যাইতেছে।

কোথাও রণ-রাক্ষসীর লোল-রসনা লকলক করিতেছে। কোথাও প্লাবনের প্রলয়োচ্ছ্বাস। কোথাও বাত্যাবর্ত্তের প্রকট প্রবাহ। সংসার শান্তিহারা হইয়া পড়িয়াছে। কেন এমন হইল? কেন সে মন্ত্র ভুলিলাম? কি সে মহামন্ত্র?—কেন সে মন্ত্র ভুলিয়া, এমনভাবে অশান্তি-রাক্ষসীর করাল-কবলে নিপতিত হইলাম?

* * *

নির্ভরতায় কি আনন্দ!

সে মন্ত্র—আবারও বলিতে হইবে কি—শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ। "মা! মা! একবার কোলে লও"—বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছ কৈ? কৈ—মা বলিয়া কেহ তো ডাকে না আর? কৈ—মার প্রতি নির্ভরতায় প্রাণপাত করিতে কেহ তো অগ্রসর নহে আর? এখন সবাই আপনার কৃতিত্বের দোহাই দিতে চায়। অজ্ঞান, বিজ্ঞানে বিপদ বিদূরণ করিতে যায়। কিন্তু কেহই জানে না—কেহই বুঝে না যে, যখন অবিশ্বাসের অনন্ত সমুদ্রে অহমিকার উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে; তখন আত্ম-নির্ভরতার অনন্ত-ছিদ্র তরণীতে আরোহণ করিয়া, মানুষ কতদূর অগ্রসর হইতে পারিবে? তাই প্রতি পদে পদস্খলন। একবার 'মা' বলিয়া ডাকিয়া দেখ দেখি? একবার তাঁর প্রতি নির্ভর করিয়া দেখ দেখি? দেখ দেখি—শান্তি পাও কি না? বিশ্বাস কর আর নাই কর, মার করুণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। যদি ঊর্দ্ধনয়নে আকুল-প্রাণে একান্তমনে ডাকিতে পার, মা কদাচ উদাসীন থাকিতে পারেন না। ডাকিতে ডাকিতে যখন নির্ঝর-নয়নে অশ্রু-বরিষণে হৃদয় ভাসিয়া যায়, তখন কি আনন্দ—কেহ

জান কি? সংসারের শোকতাপ-বিপদের যে অশ্রু, সে অশ্রু জ্বালাময়; কিন্তু মাতৃ-নির্ভরতায় নয়নে যদি অশ্রু আসে, সে অশ্রু বড় শান্তিপ্রদ। হায়!—শোকর অশ্রু দেখিয়া, প্রেমের অশ্রু ভুলিছ কেন?—কাচে হাত কাটিয়া, হীরাকে হেলায় হারাও কেন? মার প্রতি নির্ভরপরায়ণ হও।

* * *

মা—অভয়া।

মা বলিয়া ডাকিয়া মায়ের কোলে যাইতে পারিলে, শিশু সকল বিভীষিকায় অভয় পায়। "দুঃখিনী, পর্ণকুটীরে, আপনার দুখের শিশুটিকে বুকে আবরিয়া, একখানি ছেড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তৃণ-শয্যায় শুইয়া আছে; এবং শিশু যেন কোনমতে ক্লেশ না পায়, সেই জন্য, আপনার ক্লিষ্ট তনু দ্বারা শিশুর সুকুমার তনুখানি ঢাকিয়া রাখিতেছে। শিশু, এক একবার বজ্রের কড়মড় শব্দে ও বায়ুর হুহুঙ্কার-গর্জ্জনে ভয়ে চমকিত হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট শব্দে ডাকিতেছে—মা; মা অমনই, তাহার বুকের ধনকে যেন আরও বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া, আশ্বাসিত করিয়া কহিতেছে—এই ত আমি। মাতৃ-স্নেহের এইরূপ মধুর-মনঃশীতল সুকোমল অভয়-স্পর্শের পর শিশু আর ভয় করিবে কেন?—শিশুর আর ভয় থাকিবে কিসে?" যতই বিপদ আসুক, সঙ্কট যতই ঘনীভূত হউক, যে শিশু মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার সকল আতঙ্কই অন্তরিত হইয়াছে। মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে, সন্তানের আর কি ভয় আছে? মা যে অভয়া!

* * *

জগন্মাতা জগজ্জননী—শৈশবের সেই মাতৃ-

মায়ের পূর্ণমূর্ত্তি। মূর্ত্তির পূর্ণতা-রূপিণী, মাতৃস্নেহের উৎস-স্বরূপিণী। "এই সংসারে কোটি কোটি অসংখ্য অর্ব্বুদ কোটি মায়ের প্রাণে অহোরাত্র যে অমৃতময় স্নেহের স্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, তিনিই তাহার অক্ষয় প্রস্রবণ। পর্ব্বত-নির্ঝরে জল না থাকিলে, নদীর খাতে জল থাকে না। সেই আদি অথবা অনাদি প্রস্রবণেও অনন্ত স্নেহরাশি না থাকিলে, মায়ের প্রাণে স্নেহ থাকিতে পারে না।" মানুষ!—তুমি আবার যদি সেই শিশুটির মত নির্ভরতায় মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে যাও, মা বাহু প্রসারণে তোমায় ক্রোড়ে গ্রহণ করিবেন। ভ্রান্ত!—"আকাশের ঐ জ্বলন্ত জ্যোতিঃপিণ্ডস্বরূপ সূর্য্যের দিকে চাহিয়াও, আলোকের জগদুজ্জ্বলা শক্তি অনুভব করিতে অসমর্থ?" মন!—"তুমি পূর্ণচন্দ্রের প্রসন্ন-স্নিগ্ধ প্রাণ-পীণন জ্যোৎস্না দেখিয়াও, জ্যোৎস্নার অপরূপ সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে" পার না? তাই বলি, আত্মগরিমা—আত্ম-অহঙ্কার পরিত্যাগ কর। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সকল সময় মার প্রতি নির্ভরপরায়ণ হও। তাহা হইলে অশান্তিতে আর জ্বলিতে হইবে না,—শান্তি শান্তি করিয়াও আর হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হইবে না। তখন, সুখ বল, শান্তি বল, সকলই তোমার অনুগত থাকিবে। মার ছেলে, মায়ের কোলে স্থান পাইলে, তাহার সকল ভয়-ভাবনা দূর হয়। এ দৃশ্য চক্ষের সমক্ষে নিত্য প্রতিভাত দেখিয়াও মানুষ কেন ভ্রান্ত হও।

—— * ——

অগ্রসর হও।

সব সম্ভব।

দেবতা এক, দেবতা তেত্রিশ কোটী। রূপ এক, রূপ অসংখ্য। নাম এক, নাম অনন্ত। ভগবৎ-সম্বন্ধে সকলই সম্ভবপর। যিনি সর্ব্বময় সর্ব্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহাতে আবার সম্ভব অসম্ভব কি থাকিতে পারে?

* * *

ভ্রান্ততর্ক।

অন্ধের হস্তিদর্শন। আমাদের ন্যায় মূঢ় জনের ভগবদ্দর্শন-অভিজ্ঞতা—অন্ধের হস্তিদর্শনবৎ নহে কি? বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না দেখিতেই আমরা তর্ক করিয়া মরি। তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব কিরূপে অবগত হইব?

* * *

অধিকারীর ভাব।

অধিকারী অনধিকারীর প্রভাব, এইখানেই প্রকাশমান্। ভগবৎ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা-লাভের আশা করিলে, অন্তেবাসীর অবস্থায় কালাতিপাত করিবার ব্যবস্থা,—হিন্দুর নিকট তাই চিরনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। জননী-জঠোর পরিত্যাগ করিয়াই, কে আর বল, জ্ঞান-গিরির উচ্চশৃঙ্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়?

* * *

ক্রম-গতি।

বর্ণজ্ঞান না হইলে, ভাষাশিক্ষা হয় না; আবার ভাষা-বোধ না হইলে, শাস্ত্রপথে প্রবেশাধিকার জন্মে না। অধিকারী অনধিকারীর অবস্থা ইহাতেই প্রতীয়মান হয়। যাহার অক্ষর-জ্ঞান হয় নাই, তাহাতে বেদান্ত-পাঠের অধিকার

কিরূপে বর্ত্তিতে পারে? গতি-ক্রিয়ার সাহায্যেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়, গতিহীন কিরূপে অগ্রসর হইবে?

* * *

অগ্রসর হও।

হিন্দুর অস্থি-মজ্জা-ধমনীতে শিক্ষার এই শোণিত প্রবহমান্। হিন্দুর ঋষি-সন্ন্যাসী-তপস্বী, হিন্দুর বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ, হিন্দুর পুরাণ-উপপুরাণ-সংহিতা, হিন্দুর-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-সন্ন্যাস, হিন্দুর সাকার-নিরাকার সর্ব্ববিধ উপাসনা,—পর্য্যায়ক্রমে এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। আগে শিক্ষার্থী হও; স্বরূপ-তত্ত্বে অভিজ্ঞতা-লাভ কর;—তখন আপনিই অগ্রসর হইতে পারিবে। তিনি এক, তিনি বহু, তিনি অনন্ত; তিনি বিরাট্, তিনি ক্ষুদ্র, তিনি অণু। বিরাটের ধারণা বিষম বুঝিয়া, পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রয়োজন নাই। 'অণু অণু' অনুসরণেই অগ্রসর হও,—সকল শ্রেণীর সুগম পথ আপনিই আয়ত্ত হইবে। হিন্দুর এই শিক্ষা—"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।" সকল জাতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীই 'সাম্য সাম্য' করিয়া চীৎকার করেন; কিন্তু উন্নত পতিত মধ্যবিত্ত সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের শুভপ্রদ কি সুচারু ব্যবস্থা—হিন্দুর! যিনিই যেমন হউন, যোগ্যতা জন্মাইয়া উচ্চতা-সম্পাদক এমন উচ্চ সাম্য ভাব—আর কোথাও আছে কি?

—*—

অনুযোগ।

ঈশ্বরে অনুযোগ।

জগদীশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের অনুযোগের অবধি নাই। সকল পাপের ভার তাঁহার স্কন্ধে চাপাইতে পারি না বলিয়াই যেন কত ক্ষোভ! তাই কখনও বলি—তিনি মরিয়াছেন; কখনও বলি—তিনি অন্ধ হইয়াছেন; কখনও

বলি—তিনি কানের মাথা খাইয়াছেন; কখনও বলি—তিনি স্থবির বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অবস্থায় কোথায় কোন্ প্রান্তে পড়িয়া আছেন!

* * *

অস্তিত্ব কোথায়?

আমি ডাকিবা মাত্রই, আমার গাড়ু-গামছা-বাহী ভৃত্যের ন্যায়, কেন তিনি আমার পশ্চাতে আসিয়া হাজির হন না? আমি কর্ম্মের ঘোরে কুম্ভীপাকে পড়িয়া বিপর্য্যস্ত হই; অসীম শক্তি-শালী যদি তিনি, কেন আসিয়া আমায় উদ্ধার করেন না? তাই যদি না পারিলেন, তবে কেমনে বুঝিব—তাঁহার অস্তিত্ব বা কৃতিত্ব কোথায় কতটুকু?

* * *

স্থূল দৃষ্টান্তে।

একটু তলাইয়া দেখিলেই যাহার মীমাংসা হয়, সেই সামান্য তর্ক-তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে আমরা দিশাহারা হইয়া পড়ি। সংসারের একটা স্থূল দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করি! আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ, এক স্বতন্ত্র মহাদেশের সীমান্ত-দ্বীপে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা কয় জন তাঁহাকে দেখিতে পাই?—অথবা আমাদের কয় জনের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়? অথচ, ইহা স্বীকার্য্য—ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তিনি আছেন—প্রজার হিত-কামনায় তিনি অনুধ্যান নিমগ্ন আছেন। কত সোপান উপরে—কত স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পরে—তবে আমাদের প্রার্থনা তাঁহার কর্ণে পৌছিলেও পৌছিতে পারে; হয় তো বা কত সময় মধ্যপথেই তাহা বিলীন হইয়া যায়! সংসারের সম্রাটের সম্পর্কেই যখন এই ব্যবস্থা; যিনি রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট, তাঁহার কর্ণে কিছু পৌছাইতে হইলে, কতটা আয়াস, কতটা আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক হয়—মনে হয় না কি?

শৃঙ্খলার পথে।

উপরওয়ালা। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইলে, একটা উপরওয়ালার অস্তিত্ব অবশ্যই মান্য করিতে হয়। যাহার উপরে কেহ নাই, যে জন নিকাশের দায়িত্বের ধার ধারে না,—তাহার উচ্ছৃঙ্খলা পদে পদে প্রকাশ পায়।

* * *

সদসৎ। স্বর্গ-নরক, পুণ্য-পাপ, দেবতা-দানব,—যাহা কিছু কর্ম্মফল-ভোগ-কল্পনা, সকলই উপর-ওয়ালার অস্তিত্ব-নির্ভরে। যদি উপরে কাহারও অঙ্কুশ-দণ্ড মদমত্ত মানুষকে পরিচালিত করিবার জন্য উত্তোলিত না থাকিত, তবে পাপ-পুণ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয়-ভরসায় কেহই ত্রস্ত বা আশ্বস্ত হইত না।

* * *

ঈশ্বর-কল্পনা। এই উপরওয়ালা কল্পনারই মূল ভিত্তি—ঈশ্বর-কল্পনা। ঈশ্বর যদি না থাকিতেন, পরকালের ভয় যদি না দেখান হইত, কর্ম্মাকর্ম্মের ফলাফলের কথা যদি উত্থা-পিত না হইত, তাহা হইলে কিছুরই তো আবশ্যক ছিল না! তাহা হইলে, কেবল—"খাও দাও আমোদ কর"—"Eat drink and be merry" এই মাত্র জীবের লক্ষ্য হইত। তাহা হইলে, সংসারে আর ব্যভিচারের অবধি থাকিত না, কেবলই পাপের পঙ্কে সংসার ডুবিয়া থাকিত, বিশৃঙ্খলার একশেষ ঘটিত।

* * *

শৃঙ্খলার নিদান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব,—অন্ততঃ সংসারের শৃঙ্খলা-সম্পাদনে। মৃদুমন্দ মলয়-পবন প্রবাহিত হয়, জীবের সুখশান্তি পরিতৃপ্তি সাধন করে। তাহাতে শৃঙ্খলা যদি না

থাকিত, প্রবল ঝটিকায় সংসার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া উড়িয়া যাইত না কি? বর্ষায় বিন্দু বিন্দু বারি পতিত হয়; তৃণ-উদ্ভিদ-বৃক্ষ-লতাদি রস-সঞ্চয়ে জীবনী-শক্তি লাভ করে। শৃঙ্খলা যদি না থাকিত, অবিরত প্রবল প্রবাহে দেশ ডুবাইয়া দিত না কি? সূর্য্যদেব মৃদু-কিরণ-সম্পাতে সংসার সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন; যদি সহস্রমৌলার সহস্র-ধারা যুগপৎ প্রকাশিত হইত, তবে এই সোনার সংসার জ্বলিয়া-পুড়িয়া ক্ষার হইয়া যাইত না কি? শৃঙ্খলাই জীবন। শৃঙ্খলার প্রয়োজনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

—— * ——

স্বর্গ।

সংসারেই স্বর্গ।

সংসারেই স্বর্গ আছে। হয় তো বা সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-মার্গে তাহা নাই, হয় তো বা যোগীর যোগ-সাধনার পথেও তাহা নাই; অন্ততঃ আছে কি না, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু মনে হয়, সৎকার্য্যে যে আত্মপ্রসাদ, তাহাই স্বর্গ।

* * *

স্বর্গের বোধ।

তুমি কি কখনও আপনার মুখের গ্রাস তুলিয়া অনাথ আতুর আর্ত্তের মুখে প্রদান করিয়া দেখিয়াছ—তাহাতে কি আত্মপ্রসাদ? তুমি কখনও বিপন্নের পরিত্রাণ-উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণকে বিপদসাগরে ভাসাইয়া দিয়া দেখিয়াছ—তাহাতে, কি সুখ, কি আরাম! তবেই বুঝিবে—স্বর্গ কোথায়?

* * *

স্বর্গ—নিত্যকর্ম্মে।

আমাদের প্রতি কর্ম্মে প্রতি ব্যবহারে প্রতি পাদ-বিক্ষেপে স্বর্গ-নরক প্রত্যক্ষীভূত। মান-অপমান, সম্পৎ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, শোক-শান্তি দৈনন্দিন কার্য্যে

যাহা লাভ করি, তাহাতে কি দেখিতে পাই? তাহারও মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস দেখি না কি,—কর্ম্মাকর্ম্মের ও ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেদীপ্যমান্। উপযোগিতা কার্য্যকালেই প্রতিষ্ঠিত। আর তাই দেখিয়াই মনে হয়, স্বর্গ ও নরক মানুষের নিত্য-কর্ম্মের উপরই নির্ভর করে।

—— * ——

তিনি কল্পতরু।

কল্পতরু।

কল্পতরুতলে দাঁড়াইয়া যিনি যে ফল-কামনা করেন, তরু তাঁহাকে তাহাই প্রদান করে। কবি, কবিত্ব-রস-পিপাসু; পুরোভাগে কাব্যশাখা ফলভারাবনত। দার্শনিক, দর্শন-শাস্ত্রের জটিল মীমাংসায় পারদর্শিতা-প্রয়াসী; তরু থরে থরে দর্শন-ফল সাজাইয়া রাখিয়াছে। বক্তা, বাগ্মিতা-বক্তৃতা-ফল-লোলুপ; শাখায় শাখায় বাগ্ময়ফল ঝুলিতেছে। ধার্ম্মিকের জন্য ধর্ম্মফল, অধার্ম্মিকের জন্য অধর্ম্ম-ফল,—সংসারে যে জন যে ফল অন্বেষণ করে, 'কল্পতরু'পরে সংসারনাথ তাহাই যোগাইয়া রাখিয়াছেন।

* * *

ফল-তারতম্য।

সকল ফলই যে সমান-আস্বাদ-সম্পন্ন, সকল ফলই যে সমান পাওয়া যায়, তাহা নহে। শাখায় প্রশাখায় নিম্নে মধ্যে ঊর্দ্ধে প্রতি পত্র-কোলে কত ফল স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে। কতক, বসিয়া বসিয়াই পাওয়া যায়; কতক, দাঁড়াইয়া পাড়িতে হয়; কতক, হস্ত বাড়াইয়া ধরিতে হয়; কতক, আকর্ষী সাহায্যে; কতক, অতি কষ্টে; কতক, প্রাণান্ত-পণে। আয়াসের অনুপাতে ফলেরও তাই কটু-কষায়-তিক্ত-মিষ্ট স্বাদ-তারতম্য আছে। শীর্ষস্থ সুস্বাদু-ফল অনায়াস লভ্য কিরূপে সম্ভবপর?

—— * ——

নিকটবর্ত্তী হও।

উদ্‌ভ্রান্ত।

মৃগ, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়; অজ্ঞতায় বুঝিতে পারে না, কস্তুরিকা তাহারই নাভিতল-গত। মানুষ, দিশাহারা হইয়া বেড়ায়, উধাও হইয়া খুঁজিয়া মরে কিন্তু বুঝে না,—সুখ-শান্তি তাহারই আত্মকরতলগত।

* * *

সুখ-নিকেতন।

সেই শান্তি-নিকেতন, সেই সুখ-নিদান,—তিনি তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিতেছেন! আমরা হেলায় তাঁহাকে হারাই বই তো নয়? তাঁহার একটু নিকটে যাইতে পারিলে, প্রাণের ভিতরে একটু তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, ভাবনা কি আর?—সুখ-শান্তি আপনিই করতলগত হয়।

* * *

বাহিরে ও অন্তরে।

যখন অতি দূরে থাকি, তখন কোনও সাড়া-শব্দ নাই; যখন কতক নিকটে আসি, তখন কোলা-হলকলরব মাত্র শুনিতে পাই; যখন অতি-নিকটে, তখন সুস্পষ্ট অবিচ্ছিন্ন স্বর। মহাপুরুষগণ তাই হাটে যাইবার উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া-ছিলেন,—দূর হইতে কেবল হাটের কোলাহল শুনা যায়; হাটের মধ্যে প্রবেশ করিলে ক্রয়-বিক্রয়ের সুস্পষ্ট স্বর।

* * *

নিকটে যাও।

সে যে আনন্দ-বাজার! দূরে দূরে থাকিয়া, সে বাজারের কোন্ সামগ্রী পাইবে? নিকটে অগ্রসর হও, ভিতরে প্রবেশ কর; দেখ,—আনন্দের অনন্তপশরা থরে থরে সাজান। আরও দেখ,—কত সুলভ, কত সহজপ্রাপ্য। সুখময় শান্তিময় আনন্দময় তিনি,—সুখ-শান্তি-আনন্দের অভাব কি

তথায়? মন!—একটু নিকটে যাইবার চেষ্টা কর, একবার আনন্দ-বাজারে প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হও। তবে তো সে আনন্দ পাইবে? নিকটে না যাইলে, সে রসাস্বাদ কি প্রকারে আশা কর?

—— * ——

ক্রন্দনে আনন্দ।

কাঁদে কেন?

মানুষ কাঁদে কেন? কাঁদিয়া কি শান্তি পাওয়া যায়? মানুষ, আনন্দ খোঁজে, সুখ খোঁজে, শান্তি খোঁজে; না পাইলে কাঁদিয়া আকুল হয়। কেন?—কান্নার ভিতর কি সুখ-শান্তি-আনন্দ লুক্কায়িত আছে? কে জানে, কি জটিল রহস্য!

* * *

ক্রন্দনে আনন্দ।

অত্যাচারের দারুণ কষাঘাতে বক্ষ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে; "হা ভগবন্" বলিয়া কাঁদিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম; যেন সকল জ্বালার অবসান হইল! শোকের তীব্র অনলে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে; দুই বিন্দু অশ্রুজল,—সকল জ্বালা দূর করিয়া দিল! আবার ঐ যে দেখিতেছ, দরবিগলিত নয়ন-ধারায় প্রেমিকের বক্ষঃস্থল প্লবমান্;—কি অনিন্দ্য আনন্দ তিনি অনুভব করিতেছেন।

* * *

পূর্ণানন্দ।

এ জীবনে কান্নার আনন্দ কিছু না কিছু সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু সে আনন্দের পূর্ণতা কোথায়, কেহ দেখিয়াছেন কি? আমার মনে হয়, কাঁদিয়া 'পরিত্রাহি' ডাকিয়া যিনি পাগল হইতে পারিয়াছেন, সে আনন্দের পূর্ণতা লাভ তাঁহারই অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকিবে; আমার মনে হয়, অনুতাপের অশ্রুজলে যাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হইয়াছে, আনন্দের সে স্বর্গীয় সুষমা তিনিই প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন। আমার

মনে হয়, তাঁহারই ক্রন্দন সার্থক—ক্রন্দনে কি আনন্দ তিনিই বুঝিতে পারেন—যিনি এক-মনে এক-ধ্যানে 'কোথা দয়াময়' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতে পারেন।

—— * ——

দেবতা কে ?

দেবত্ব।

মানুষ কি কখনও দেবতা হইতে পারে? এই জন্ম-জরামরণশীল দেহ, এ কি আবার দেবত্বের অমরত্বের অধিকার লাভ করিতে পারে? অথবা, দেবতা বুঝি কোনও আকাশ-কুসুম কল্পনাতীত সামগ্রী--মানুষের অদৃষ্ট অভাব্য!

* * *

মানব সমাজে।

আবহমান কাল এই সংশয়-প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছে; চলিয়াছে; আবার ঘুমিয়া পড়িয়াছে। মানুষ স্থির করিয়াও স্থির করিতে পারিতেছে না,—সত্য কি—বা সংশয় দূরীভূত হয় কি প্রকারে? তাই তাহারা কখনও বা কাহাকেও দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে, কখনও বা সেই দেবতাকে আবার পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতেছে।

* * *

চৈতন্য ও বুদ্ধ।

নবদ্বীপের তরুণ-তপন এমন যে শ্রীচৈতন্যদেব, জীবের জন্মজরাদূরকারী এমন যে জগৎ-আলো শ্রীবোধিসত্ত্ব বুদ্ধদেব,—হায়, ইঁহারাও তাই সেই পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত;—মানব-সমাজে কখনও বা সম্পূজিত, কখনও বা পাগল বলিয়া উপেক্ষিত! জাগরণ ও সুষুপ্তি, এমনই পর্য্যায়ক্রমে জড়াইয়া ধরিতেছে! সত্যনির্ণয়—এতই বিঘ্ন-সঙ্কুল, এতই সংশয়-সমাকুল।

* * *

দেবত্ব।

তবে দেবত্বের কতকগুলি লক্ষণসম্বন্ধে অদ্বৈত-ভাব, বোধ হয় অবিসংবাদিত। সত্য, সর্ব্বকালেই সমাদৃত; দয়াদাক্ষিণ্য-পরোপকার প্রভৃতি চিরদিনই সত্বগুণপর্য্যায়ে অভিহিত। আমার মনে হয়, এই সকল গুণপরম্পরার অধিষ্ঠানই দেবাংশের পরিচায়ক; এবং এই সকলের বিকাশই দেবত্বের বিকাশ। যাঁহার জীবনে যে পরিমাণে দেব-ভাবের বিকাশ, তিনিই সেই পরিমাণে দেবত্বের উচ্চ-আসনে সমাসীন। আমার মনে হয়, মানুষ এইরূপেই দেবতা হইয়া থাকে।

* * *

দুই দেবতা।

উপরে যে দুই দেবতার নাম উল্লেখ করিলাম, নরদেহধারী হইয়াও উঁহারা দেবতা। দেবত্বের বিকাশ, উঁহাদিগের মধ্যে কি অপরিসীম! যে কালে পশুবলি হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতে নরবলি পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, কপিলা-বস্তুর রাজ-ভবন আলোকিত করিয়া সেই কালে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হন। কিন্তু সেই সুখৈশ্বর্য্যপালিত রাজকুমার অবহেলায় সুখসম্পৎ ত্যাগ করিয়া, বলিদানোৎসর্গীকৃত সামান্য ছাগ-শিশুটীর জীবনরক্ষা-বিনিময়ে যেদিন অকুণ্ঠিত-চিত্তে যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন; সেই দিন কি তাঁহার দেবত্বের বিকাশ দেখিলাম না? শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসাইয়া দিলেন;—ঊষর অনুর্ব্বর হৃদয়-মরুক্ষেত্রে ভাবাঙ্কুর উদ্গত হইল; বিতর্ক কণ্টকে বিচ্ছিন্ন হৃদয় নাম-গান রূপ অপূর্ব্ব অমৃত ফল লাভ করিল। পাপী-তাপী যে যেখানে ছিল, সকলেরই পরিত্রাণের পথ সুগম হইল। দেবতা তো তাঁহারাই,—যাঁহারা পরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন। দেব-ভাবের বিকাশ যাঁহাতে যতটুকু পরিস্ফুট, দেবত্বের

সন্নিকর্ষে তিনি ততটুকু অগ্রসর। দেব-ভাবের বিকাশে এই মানুষই দেবতা হইতে পারে।

— * —

সৎপ্রজ্ঞায়।

জ্ঞান ও কর্ম্ম।

পক্ষিগণ উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশে বিচরণ করে; শাস্ত্র বলেন,—মনুষ্য তদ্রূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ের সাহায্যে মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। মোক্ষের পক্ষে উভয়েরই সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

* * *

যুগপৎ প্রয়োজন।

কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, কর্ম্মমূলে জ্ঞানের সঞ্চার না থাকিলেও কর্ম্ম পণ্ড হয়। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সদ্জ্ঞানের বিকাশ, আবার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইতেও সদ্জ্ঞানের আবশ্যকতা। সুতরাং সদনুসরণে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই যুগপৎ কার্য্যকারিতা উপলব্ধ হয়।

* * *

সদ্গুরু।

সদ্গুরু প্রয়োজন; তিনি সদ্জ্ঞান-বিহিত সৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে শিক্ষা প্রদান করিবেন,—সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ সদ্জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। শাস্ত্র তাই কহিয়াছেন,—"দর্পণে যেমন সন্নিহিত ভূমি প্রতিবিম্বচ্ছলে প্রবেশ করে, তেমনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্রার্থ সমুদয় হৃদয়ে প্রবেশ করে। মহারণ্যে কদলী যেরূপ মূল প্ররোহাদির বিস্তারে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সৎপ্রজ্ঞাও তদ্রূপ বিবেকিজনের স্থানেই আশ্রয় লইয়া শাস্ত্রার্থরূপ রসসম্পর্কে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।" কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি তিনের স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্যই সদ্গুরুর প্রয়োজন। সদ্গুরুর সৎশিক্ষা প্রভাবে পথ পরিদৃষ্ট হয়।

জ্যোতিঃ-স্বরূপ।

ঈশ্বর—অন্তরে।

কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাকের পশ্চাৎ ছুটিয়াছ কেন? কাণে হাত দিয়াই দেখ আগে—কাণ আছে কি না? 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া সারা পৃথিবী উলোট-পালোট করিয়াও কোনও ফললাভ হইবে না। ঈশ্বর তোমার অন্তরেই অধিষ্ঠিত আছেন।

* * *

স্বর্গ ও নরক।

ইহজীবনেও কর্ম্মফল-বৈগুণ্যে স্বর্গ-নরক-ভোগ পরিদৃষ্ট হয়। দয়া-দাক্ষিণ্য-পরোপকারাদি সৎ-কর্ম্মের যে বিমল আনন্দ, আর মিথ্যা-পরস্বাপহরণ প্রভৃতির যে অশেষ মনঃকষ্ট,—উহাই কি প্রকারান্তরে এ জীবনে স্বর্গ-নরক-ভোগ নহে? সুদূর ভবিষ্যের পরলোকের প্রতি দৃষ্টি যদি না পৌছাইতে পারে, ইহলোকের স্বর্গসুখই বা হেলায় হারাও কেন?

* * *

স্বরূপ-তত্ত্ব।

যাঁহাতে উদ্ভব, তাঁহাতেই বিলয়। তিনিই যদি সর্ব্বভূতের বিলয়নিদান, তবে এ সংসারে তাঁর কি ভাব-বিকাশ দেখিতে পাই? পরমহংস শ্রীমৎ শিব-নারায়ণ স্বামী মহোদয় বলিতেন,—তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য-নারায়ণ, অগ্নি-মুখেই তাঁহার লয়-ভাববিকাশ। উচ্চ-নীচ শ্রেষ্ঠ-অধম বিষ্ঠা-চন্দন যে কোনও সামগ্রীই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রদান কর না কেন, সম-নির্ব্বিশেষে সকল সামগ্রীই অগ্নি গ্রাস করেন। এমন সার্ব্বজনীন লয়-স্থান, তাঁহার অংশ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বৈদিক-কালে হোমাগ্নিতে আহুতি, তাই ভগবদুদ্দেশ্যেই প্রতিপন্ন হয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ; অগ্নিপূজা,

জ্যোতিঃ আরাধনা, সূর্য্যের উপাসনা প্রভৃতি প্রবর্ত্তনার ইহাও একতম কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি।

— * —

ভগবান আশা-রূপী।

আশাই কি প্রাণ?

বিপদ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া, মানুষ আশার তৃণ আশ্রয় লয়। আশাশূন্য প্রাণ বাঁচিতে পারে না। তবে আশাই কি প্রাণ-রূপে অবস্থিতি করিতেছে?

* * *

আশা ভগবান।

ভগবান কি আশা-রূপী! নৈরাশ্যের সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ হতাশ্বাস হইয়াও মানুষ যখন ডাকে—'ভগবান্,—রক্ষা কর'; তখন কি মনে হয়? তিনিই কি আশা-রূপে আবির্ভূত হইয়া প্রাণ-রক্ষা করেন না? তাই হতাশার পর আশা—তাঁহারই পরিচয়-চিহ্ন বলিয়া মনে হয়।

— * —

কর্ম্মেই তিনি প্রাপ্য।

কর্ম্মই পন্থা।

কর্ম্মই ধর্ম্ম। কর্ম্মই তাঁহাকে পাইবার পন্থা। আমরা যখন দেখিতে পাই,—ফল-মাত্রই কর্ম্মের অনুসারী, আর ফললাভ-কামনা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তখন তদনুগমন ভিন্ন সংসারীর আর প্রকৃষ্ট পথ কি আছে?

* * *

কর্ম্মের বিচার।

তবে বিচার করিয়া দেখার প্রয়োজন,—কর্ম্ম কি? শাস্ত্র বলেন—"তৎকর্ম্মং হরিতোষং যৎ।" সাত্ত্বিকগণ কহেন,—"পরোপকার, জীবে দয়া, দরিদ্রে দান,

সত্য ও সদাচার প্রভৃতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" সুতার্কিকগণ, তর্কের পর মীমাংসা করেন,—"বিবেক-বুদ্ধির অনুমোদিত কর্ম্মই কর্ম্ম।"

* * *

কর্ম্মেই সব।

যাঁহাদের উপদেশ-অনুশাসনে সর্ব্বথা আস্থা স্থাপন করিয়া মনুষ্য-সমাজ পরিচালিত হয়, প্রোক্ত প্রকারের কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহারাই আমাদিগকে প্রবৃত্তি প্রদান করেন। মনুষ্যের বিবেক-বুদ্ধিও স্বতঃই ঐ পথে নিয়ন্ত্রিত হয়। নির্ব্বাণ বল, মুক্তি বল, ভগবৎ-সামীপ্য বল, কর্ম্ম হইতে সকল পথ প্রশস্ত হয়।

———*———

স্বর্গের দুয়ার।

স্বর্গের পথ।

স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছিতে হইবে। কোন্ পথে যাইব, কেহ বলিয়া দিতে পার কি? মানুষ প্রতিনিয়ত সেই পথ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। কোনও পথ ধরিয়া কেহ অগ্রসর হউন বা না হউন, পথসম্বন্ধে বিতণ্ডার অবধি নাই; পরন্তু পথে যানাদির বিষয়েও বহু বিতর্ক উত্থিত হয়।

* * *

অগ্রসর হও।

অথচ, সামান্য একটু তলাইয়া কেহই বুঝি না— 'বৃথা বিতর্কে ফল কি?—একটা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়া দেখি না কেন?' ভারতে নানা তীর্থস্থান আছে; তাহার যে কোনও একটী তীর্থস্থানে যাইবার নানা পথ ও নানাবিধ যানের ব্যবস্থা আছে। হয় তো তাহার কোনও পথ সুগম, কোনও পথ দুর্গম; হয় তো তথায় কোনও যানে সত্বর যাওয়া যায়, কোনও যানে যাইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু 'যাইব' উদ্দেশ্য থাকিলে, যাওয়া যায়—নিশ্চয়ই। স্বর্গের পথও তদ্রূপ।

যে পথেই হউক, লক্ষ্য স্থির রাখিয়া অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। বৃথা তর্ক করিয়া কালক্ষয়ে কাজ কি?

—— * ——

তিনি জ্যোতির্ম্ময়।

জগদীশ্বর কৈ?

জগদীশ্বরকে কেহ দেখিয়াছেন কি? নানা জনে নানা প্রকারে তাঁহার সন্ধান করিয়া ঘুরিতেছেন; কেহ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী সাজিয়া, কেহ অনশনে, কেহ অধোমুখে, কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কত জনে কত প্রকারে তাঁহাকে খুঁজিতেছেন; কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিয়াছেন কি?

* * *

তাঁহার স্বরূপ।

তিনি সংসারের প্রাণস্বরূপ, আত্মা-স্বরূপ; সৃষ্টির মাঝে সর্ব্বঘটে ওতঃপ্রোত বিরাজমান। শাস্ত্র-বাক্যে, লোকমুখে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বদা এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। যদি তাহাই হয়, তবে তেমন সামগ্রী সংসারে কি দেখিতে পাই? প্রাণ-ভূত আত্মাস্বরূপ এমন কোন্ বস্তু সংসারে বিদ্যমান? মনে হয় না কি—জ্যোতিঃ ভিন্ন তাহা আর কি হইতে পারে?

* * *

তিনি জ্যোতির্ম্ময়।

নাম জ্যোতির্ম্ময়। জ্যোতিঃ—স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর জীবের জীবন-স্থানীয়। সেই জ্যোতিঃ ব্যতীত প্রকৃতি প্রকটিত হইত না। জ্যোতিঃহীন উষ্ণতা-হীন হইলেই জীবের জীবন অবসান হয়। জ্যোতিঃ কোন্ পদার্থে—কোন্ প্রাণি-দেহে বিরাজমান্ নহে? তিনি জ্যোতিঃ-স্বরূপ—জ্যোতিঃই তাঁহার অংশভূত। সুতরাং যদি কেহ জগদীশ্বরকে দেখিতে চান, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অবলোকন করুন।

তিনি সত্য-স্বরূপ।

সত্য এক।

সত্য এক। এক ভিন্ন অন্যরূপ হইতে পারে না, হওয়াও সম্ভব নহে। যাহা বিদ্যমান্, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে; না করিলে, তাহা সত্য হইল না। সত্য এক; অপরিবর্ত্তিত; তাহার অন্যথা নাই।

* * *

সৎস্বরূপ।

বিদ্যমানতাই যদি সৎ, তবে সংসারে যাহা কিছু আছে বা ছিল, তাহাই সৎ। শাস্ত্র বলেন—জগদীশ্বর সর্ব্বজীবে সমভাবে বিদ্যমান। তবে কি জগদীশ্বরই সেই সৎসামগ্রী? মনীষিগণ তো তাহাই বলেন! জ্ঞানিগণ তো তাঁহাকে সেই রূপেই দর্শন করেন! সৎ তিনি—সত্য তিনি। সুতরাং সত্যের অনুসরণই তাঁহার অনুসরণ।

—— * ——

একমেবাদ্বিতীয়ং।

ঈশ্বর কয় জন?

ঈশ্বর কয় জন? আমার ঈশ্বর একজন, তোমার ঈশ্বর একজন, হিন্দুর ঈশ্বর একজন, মুসলমানের ঈশ্বর একজন, খৃষ্টানের ঈশ্বর একজন, জৈনের ঈশ্বর একজন,—ঈশ্বর কি এত জন আছেন? প্রতি সম্প্রদায়ের আবার উপ-সম্প্রদায়ই বা কত? সুতরাং তাহাদেরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর মানিতে গেলে, অগণ্য অনন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

* * *

বিশৃঙ্খলায়।

আবার এক এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হইলে, কোন্ ঈশ্বরের ক্ষমতা কত—তাহার পরিমাপ করার আবশ্যক হয়, এবং সেই সেই বুঝিয়া সেই সেই ঈশ্বরের

আরাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। এ সকল বড়ই বিশৃঙ্খলার বিষয়। এইরূপ বিশৃঙ্খলাতেই মানুষ উদ্ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতেছে। অতএব অন্ধের ন্যায় অনুসরণ না করিয়া স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার চেষ্টা করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

* * *

স্বরূপ-জ্ঞানে।

স্বরূপ-তত্ত্ব স্থূলতঃ এইরূপে বুঝিতে হয়। 'জল' যে পদার্থ, সংসারের সকল মনুষ্যেরই সে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। অগ্নির যে দাহিকা-শক্তি—এ অনুভবও মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ। 'জল' যেমন কলসীতে থাকিয়া কলসীর জল, পুষ্করিণীতে থাকিয়া পুষ্করিণীর জল, নদীতে থাকিয়া নদীর জল, বিভিন্ন আধারে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়; একই অগ্নি যেমন রূপভেদে প্রদীপ, পাকশালা, বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়;—ঈশ্বর-সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হয়। স্বরূপ একই; কেবল নামভেদে রূপভেদে ভিন্ন সামগ্রী ভাবিয়া ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করি মাত্র। নচেৎ, স্বরূপজ্ঞানে সেই "একোমেবা-দ্বিতীয়ং", এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।

—— * ——

চিত্ত স্থির কর।

চঞ্চল চিত্ত।

চঞ্চল চিত্ত, একবার স্থির হইতে পারিল না! বাত্যা-বিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায়, নিয়ত উদ্বেলিত উচ্ছৃঙ্খল-ভাবেই রহিয়া গেল! আমার বিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন, আমার সংসার, আমার—আমার,—দুশ্চিন্তা-ঝটিকা প্রচণ্ড প্রবহমান; চিত্ত কিরূপে প্রশান্ত হইবে!

* * *

চিত্ত-স্থৈর্য্য। অথচ, চিত্ত-স্থৈর্য্য প্রথম প্রয়োজন। শাস্ত্র ভুয়োভুয়ঃ বলিয়া গিয়াছেন, গতি-মুক্তির প্রার্থী হইলে মানুষের চিত্ত-স্থৈর্য্য প্রথম প্রয়োজন। তবে গতি কি? উপায় কি? আমার চিত্ত-স্থৈর্য্য কিরূপে হইবে! শাস্ত্র তাহারও পথ দেখাইয়া দিয়াছেন—"যিনি বিষয়-বাসনা ও মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই প্রশান্ত!"

* * *

ভগবৎ-অনুভূতি। "সমুদ্রে কত তরঙ্গ উঠে; কিন্তু তাহারা তো সেই জলময় জলধির রাশি রাশি জল ভিন্ন আর কিছুই নহে! তদ্রূপ এই অখিল সংসার-বাসনা-ভূত কল্পনাময় জগৎ-প্রপঞ্চ কল্পনাকুশল চিত্তে উত্থিত হয়। ভাবিয়া দেখিতে পারিলে, সংসার-ভাবনা ছাড়িতে পারিলে, কেবল মাত্র সেই অদ্বিতীয়ের সত্ত্বাবোধ অপরাপর অলীক-প্রপঞ্চ অস্তিনাস্তি-বোধ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারিলে, সংসার-জনয়িতা বাসনাদি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, তাহাদের নামও আর থাকে না! সংসারই তরঙ্গ; প্রশান্ত চিত্তে সংসার নাই, প্রশান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ নাই। তাহা কি সুন্দর!"

* * *

তিনি সর্ব্বময়। সকল চিন্তার মূলেই সেই চিন্ময়ের অধিষ্ঠান। "এই যে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার ইন্দ্রিয়চয় এবং এই যে জীবগণ, ইহারা সেই চিন্ময়কে অতিক্রম করিয়া কোথায় থাকিতে পারে? এই যে নানাত্ব—এই যে নানাবস্তুময় সংসার—ইহা কি? যেমন নেত্ররোগ জন্মাইলে বা দর্পণে দেখিতে যাইলে এক চন্দ্রকে অনেক আকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ

আমরা ভ্রমে পড়িয়া তাঁহাকেই নানা-বস্তুরূপে সংসারে দেখিতেছি।” আহা!—কবে আমরা তাঁহাকে এই সর্ব্বময়ভাবে দেখিতে শিখিব?—কবে আমাদের এই চঞ্চল-চিত্ত প্রশান্ত ভাব প্রাপ্ত হইবে?—কবে আমরা তাঁহার একত্বের বিকাশ দেখিব?

* * *

জগৎ—ব্রহ্ম।

প্রকারান্তরে, আরও একটু উচ্চস্তরে, শাস্ত্র দেখাইয়াছেন,—“জ্ঞান—অগ্নি, চিত্ত—তৃণ; এ তৃণকে সে অগ্নি দিয়া এমন করিয়া পোড়াইতে হইবে, যেন তাহার মূল না থাকে। আমার চিত্ত, আমার পুত্র, আমার পরিজন, ইহাই ঈষণা দুরাকাঙ্ক্ষা, এই দুরাকাঙ্ক্ষাই চিত্তের মূল; এই মূল সহ ইহাকে পোড়াইতে পারিলে, আর কদাচ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। নতুবা অনুৎপাটিত পরিশুচ্ছিন্ন তৃণ যেমন দগ্ধ হইলেও আবার অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ ইহারও পুনর্বিকাশ অনিবার্য্য। চিত্তের চিত্তরূপ বিকাশই জগতের বিকাশ; চিত্ত দগ্ধ কর, তখন আর তোমার কাছে জগৎ থাকিবে না। তখন—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই জগৎ।” জানি না, সেই জ্ঞান-অগ্নি-দ্বারা এই চিত্ত-তৃণ কবে দগ্ধ হইবে?

—— * ——

প্রাণ দেও।

জলে রেখা।

সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। দিগন্ত-বিস্তৃত তাহার প্রশান্ত বক্ষ। ক্ষুদ্র আমি, কীটাণুকীট, আমার ক্ষুদ্র কর-রেখায় তাহাকে বিভক্ত করিতে চাই। মানুষের ভ্রান্তি ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?—বলিতে পারি না।

* * *

বৃথা আয়াস। যাঁহারা অধিক সামর্থ্যবান্, তাঁহারা না হয় অস্ত্র-শস্ত্র লইয়াই রেখাপাতে অগ্রসর হন। কিন্তু তাহাতেই বা আসে যায় কি? যতই আয়াস প্রয়াস হউক না কেন, জলের রেখা জলেই মিশাইয়া যায়।

* * *

সাফল্যের আশা। যদি রেখাপাত করিতেই হয়, যদি ক্ষুদ্র শক্তিরই একটা পরিচয়-চিহ্ন রাখা শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে কর, তবে আপন অস্তিত্ব তাহাতে মিশাইয়া দেও। তাহাতে সাফল্যের কতক আশা আছে? যদি রেখাপাত করিতেই হয়, আপন দেহপাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে?

* * *

প্রাণ সমর্পণ। ভগবৎ সম্বন্ধেও ঠিক সেই ভাব। আমরা 'ভগবান ভগবান' বলিয়া যে কিছু চীৎকার করিয়া থাকি, সকলই মহাসমুদ্রে রেখা-অঙ্কনবৎ। কেন?—প্রাণ ঢালিয়া দিয়া দেখি না কেন? যখন দেখিতে পাই—মহাসমুদ্রে রেখা-পাত করিয়া উঠিতে পারি না, শত ডাক ডাকিয়াও কোনও ফল-লাভ হয় না, প্রাণটা ঢালিয়া দিয়া দেখি না কেন?

—— * ——

যজ্ঞাহুতি।

নিষ্কাম কর্ম্ম। গীতার অমূল্য উপদেশ,—কর্ম্ম করিয়া যাও, কিন্তু কদাচ ফলাকাঙ্ক্ষা করিও না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সখা অর্জ্জুনকে পুনঃপুনঃ এই উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আর এই মহত্তত্ত্ব লইয়াই জগৎ আজ আন্দোলিত।

* * *

যজ্ঞাহুতিতে।

কিন্তু গীতোক্ত এই কর্ম্মসাধনের সার্থকতা আমরা কোথায় সমাহিত দেখি? উপদেশের অন্তরে আদর্শ কি কিছু বিদ্যমান নাই? আমাদের মনে হয়, যজ্ঞাহুতি নিষ্কাম-কর্ম্মের পূর্ণস্ফূর্ত্তি! অগ্নিতে আহুতি-দান-ক্রিয়া একরূপ নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধন। যজ্ঞাহুতির পর নিষ্কাম-কর্ম্ম সাধনের কি কিছু অবশিষ্ট থাকে?

* * *

আদর্শ-গ্রহণ।

যজ্ঞকুণ্ডে লকলক অগ্নিমধ্যে ঘৃত পুষ্প গন্ধদ্রব্য আহুতি প্রদান—নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? বৈদিক কাল হইতে সংসার যজ্ঞ-কাণ্ডের মহিমা উপলব্ধি করিয়া আসিতেছে। সে আদর্শেও কি আমরা নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুসরণ করিতে শিখিব না? অগ্নিতে আহুতি দেও, ভগবান্ তুষ্ট হইবেন,—ইহা আর কোন্ অর্থ বুঝায়? বুঝায় না কি—নিষ্কাম-কর্ম্মই ভগবৎ-প্রাপ্তির মূলীভূত।

—— * ——

অদ্বিতীয়।

একত্ব।

সৃষ্টির মাঝারে একত্বের বিকাশ দেখি। এক মানুষ—দুই নাই; এক বৃক্ষ—দু'টি দেখি নাই; দুটি ফুল—এক নয়, দুটি পক্ষী,—এক নয়, দুটী কোনও সামগ্রী একরূপ নহে! ঠিক তেমনটি—নিখুঁত দ্বিতীয়টি, সৃষ্টি সামগ্রীর কোথায় আছে? স্বতঃই প্রকাশমান, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই।

* * *

পূর্ণত্ব।

সেই এক। স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া যাও, সেই এক। বৃহৎ হইতে বৃহত্তম, মহৎ হইতে মহত্তম, সুন্দর হইতে সুন্দরতম—সেই এক। পূর্ণত্ব—

সেই একে। তবে ব্যবধান অনন্ত। অদূরে দেখিতেছি, আকাশে পৃথিবীতে কোলাকুলি করিতেছে; কিন্তু যেই অগ্রসর হইতেছি, অমনি দূরে অতি-দূরে সরিয়া যাইতেছে। সৃষ্টির ও সৃষ্টিকর্ত্তার মাঝে যেন সেই ব্যবধান। তিনি অদ্বিতীয়।

—— * ——

ক্ষোভে শান্তি।

ঈশ্বরে অবিচার।

ঈশ্বরের কি অবিচার? যুগ যুগান্ত হইতে মানুষের ক্ষোভের পরিসীমা নাই যে, ঈশ্বরের কি অবিচার? এ সংসারে একজন বিনা-আয়াসে সুখসম্পৎশালী, অন্যজন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও এক মুষ্টি অন্নের ভিখারী! কেন এমন হয়?—এ ক্ষোভ আর রাখিবার স্থান নাই।

* * *

কেন এমন হয়?

কেন এমন হয়? সংসারে নিত্যই এই শুনিতে পাই,—প্রশ্ন উঠে—"কেন এমন হয়?" কোনও মহাপুরুষ এ সম্বন্ধে এক দিন বড় সুন্দর এক উত্তর দিয়াছিলেন। সে উত্তরটী এই,—এক জন বিনা আয়াসে সুখ সম্পদের অধিকারী, আর একজন যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও অন্নের ভিখারী,—ইহা বুঝিতে হইলে, বুঝিয়া দেখ দেখি, তোমাদের হস্ত পদ ও জিহ্বা প্রভৃতির সম্বন্ধ। হস্তপদ খাটিয়া খাটিয়া আহার আহরণ করিতেছে, আর জিহ্বা রসাস্বাদে তৃপ্ত হইতেছে; আরও একটু সূক্ষ্মভাবে বুঝিলে বুঝিবে,—জিহ্বাও কেহ নয়,—রসাস্বাদ করিতেছি—আমি। এ বিষয়েও সেই ভাব বুঝিবে।"

* * *

বিরাটত্ব-জ্ঞান । এ সংসার যাঁহারা সেই বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সর্ব্বময় সর্ব্ব-স্বরূপ সর্ব্বাধার তাঁহার বিশেষণের যাঁহারা সার্থকতা বুঝিয়াছেন, এ ভিন্ন তাঁহারা আর কি উত্তর দিবেন? তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই উদ্দেশ্য-সাধনে কর্ম্ম করিয়া চলিয়াছি; আমার কর্ম্ম আমার শুভাশুভ বৃথা-কল্পনায় আত্মহারা হই কেন? হস্ত-পদ অঙ্গ খাটিয়া মরিতেছে, আর জিহ্বা-অঙ্গ রসাস্বাদ-সুখ অনুভব করিতেছে,—এই অলীক কল্পনায় কোন্ অঙ্গ কার্য্যে বিরত হয়, বলুন দেখি? সেই ভাব ভাবিয়া, কেহ সুখী ও কেহ কষ্টভাগী ভাবিয়া, ক্ষোভ করা বৃথা মাত্র। কার্য্য তিনিই করিতেছেন,—এই ভাবই শান্তি-মূলক, এই জ্ঞানই শ্রেয়ঃসাধক।

* * *

শৃঙ্খলা মূল। শৃঙ্খলাই সৃষ্টি-রক্ষার মূলীভূত। যদি শৃঙ্খলা না থাকিত, যদি কোনও বিহিত বিধানে জগৎসংসার পরিচালিত না হইত, তবে সৃষ্টি থাকিত না। তাই সৃষ্টি-রক্ষার জন্য শৃঙ্খলা অগ্রে প্রয়োজন।

* * *

শৃঙ্খলার কর্তৃত্ব। আবার শৃঙ্খলা মানিতে হইলে সেই পুরাতন কথা আসিয়া পড়ে। কাহারও কর্তৃত্ব স্বীকার অবশ্যই করিতে হয়। সংসারে দণ্ডবিধির বিধান প্রচলিত;—তাহা প্রতিপালন হইতেছে কি না—দেখিবার জন্য, উপরে রাজ-পুরুষগণ আছেন, রাজা আছেন। উপরে যদি কেহ না থাকিত, তবে শৃঙ্খলা কে মানিত? সব বিশৃঙ্খল হইত।

* * *

শৃঙ্খলায় ঈশ্বর।

রাজ্য অরাজক হইলে সংসারের যে দশা উপস্থিত হয়, কাহারও কর্তৃত্ব না থাকিলে, সৃষ্টিরও সেই দশা ঘটিত। সংসারে সৎকর্ম্মে সুযশ-সুনামের ভরসা; পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক-কল্পনাও সেইরূপ সৃষ্টির শৃঙ্খলার জন্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব—সেই শৃঙ্খলার মূলীভূত। তিনি শৃঙ্খলার আধার।

—— * ——

একবার ডাক।

দিনান্তে মুহূর্ত্ত।

দিনান্তে মুহূর্ত্ত সময়! সেই সময়টাই যেন কত অপব্যয় বলিয়া মনে হয়! সেই সময়টাই যেন কত বেশী হইয়া বাড়িয়া যায়! সময়ের টানাটানি—সেই এক কেবল বিষয়ে—সেই ইষ্ট-আরাধনায়। হায় সময়!

* * *

দারুণ অন্তরায়।

কি কাজের লোকই হইয়াছি আমরা? দিনান্তে মুহূর্ত্ত সময়,—সেইটাই কি এত বেশী হইল,? অপব্যয় কি সময়ের করি না কিছু! যত টানাটানি তাই ইষ্ট-সাধনার সময়টুকু লইয়া! চাকুরী আছে, সংসার আছে, পুত্র-পরিজন আছে, আরও কত কি অন্তরায় আছে,—সকল অন্তরায় আসিয়া সেই সময়টুকুর পথে দণ্ডায়মান হয়!

* * *

একটু অনুধ্যানে।

তাঁহার অস্তিত্বে যাঁহার অবিশ্বাস নাই, সময়ের অসঙ্কুলান-হেতুবাদ,—তাঁহার পক্ষে অপরাধ-জনক নিঃসন্দেহ। সন্দেহবাদী যিনি, তাঁহারও একটু সূক্ষ্ম অনুধাবন কর্ত্তব্য নহে কি? আছেন কি না,—সন্দেহ তাঁহার; সেই সংশয়-ঘোরেই ইষ্টারাধনায় সংশয় তাঁহার! কিন্তু তাঁহারও কি

মনে হওয়া কর্ত্তব্য নহে,—'যদি থাকেন!' না-থাকার প্রমাণ যখন নাই কিছু, কেবল সংশয়-মাত্র অবলম্বন যখন; তখন থাকার কথাটাই ভাবিতে হানি কি? একটু তো সময়—দিনান্তে তো মুহূর্ত্ত সময়! গেলই বা সেটুকু! যদি থাকেনই তিনি! এ ভাবটুকুও কি আমাদের মনে আসিবে না?

—— * ——

পথ।

সংসার উদ্ভ্রান্ত।

সংসার কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? সংসার উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নানা জনে নানা পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। সংসার কোন্ পথে অগ্রসর হয়?

* * *

কঠোর সমস্যা।

নানা দেশ, নানা জাতি, নানা ধর্ম্ম, নানা পর্য্যায়। কেহ হিন্দু, কেহ মুসলমান, কেহ খৃষ্টান, কেহ বৌদ্ধ, কেহ বা অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী। এক একটী ধর্ম্মের মধ্যেও আবার নানা শাখা-প্রশাখা আছে, নানা শ্রেণী-বিভাগ দেখিতে পাই। বড় কঠোর সমস্যা!—কোন্ পথে অগ্রসর হই?

* * *

কোন্ পথ?

এই সমস্যা-সাগরে পড়িয়া সংসার আবহমান্ কাল হাবুডুবু খাইতেছে। হিন্দু হইয়াও, হিন্দুর মধ্যে যখন দেখিতে পাই—বিবিধ বিষয়ে মত-পার্থক্য রহিয়াছে; শাস্ত্র-পথে প্রবেশ করিয়াও যখন দেখিতে পাই—বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, মুনিগণেরও এক মত নহে; তখন মনে কতই সমস্যার উদয় হয়? সংসার কোন্ পথে অগ্রসর হইবে? সংসারীর ইহাই প্রথম ও প্রধান সমস্যা।

সুগম কি ?

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম,—ভগবৎ-সমীপে অগ্রসর হওয়ার প্রধানতঃ তিনটী পথ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট। নানা জনে ঐ পথ-ত্রিতয়ের নানারূপ ব্যাখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংসারীর একরূপ, সন্ন্যাসীর একরূপ,—নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ ব্যাখ্যা। কিন্তু ক্ষুদ্র সংসারী আমাদের মনে একটা ভাব উদয় হয়। সে ভাব,—জ্ঞানের দ্বারা অবগত হইয়া ভক্তি-সহযোগে কর্ম্ম করা। তাহাই কি সে পথের নিয়ন্তা নহে ? পথ অনন্ত, লক্ষ্য এক ;—লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কর্ম্ম করাই ভগবৎসমীপে অগ্রসর হওয়ার সুগম পথ।

—— * ——

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

মানুষের জীবনে।

মানুষের জীবনে দুইটি দিন ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরের স্মৃতি বিস্মৃতির গহ্বরে যতই মানুষ ডুবাইতে চায়, জলমধ্যে প্রোথিত তৈলপদার্থের প্রায়, ততই তাহা ভাসিয়া উঠে। কিন্তু সে দুইটী দিন!

* * *

অনস্তিত্ব।

মানুষ ধন উপার্জ্জন করে, সুখসম্ভোগ করে, অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব স্থাপন করে,—সে সব যেন তাহার আপন কৃতিত্ব-প্রভাবে! তখন মনে করে,—'আমিই সব করিতেছি; ঈশ্বর আবার কোথাকার কে ?' ঈশ্বরের অস্তিত্ব তখন ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

* * *

বিপত্তির দিনে।

কিন্তু সে অস্তিত্ব প্রকট হয় কোন দিন ? যে দিন নিজের কৃতিত্বে কুলান পায় না, বিপত্তির সহিত সংগ্রামে আত্মত্ব যেদিন পর্য্যুদস্ত হয়, সেদিন আর

উপায় থাকে না; সেদিন সেই ভগবান্ বেচারার উপর ক্রটি-বিচ্যুতি-সব ন্যস্ত করিয়া, মানুষ তৃপ্তিলাভ করে। বিপদের দিনে মানুষকে তাই ডাকিতে হয়—'ভগবান্, রক্ষা কর।'

* * *

শৃঙ্খলার মূলে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে হয়—আর এক দিন। সমাজে শৃঙ্খলা-রক্ষার যে দিন আবশ্যক হয়; পিতা, মাতা, অভিভাবক, সমাজপতি, রাজপ্রতিনিধি বা সম্রাট্ প্রভৃতির স্তরগত প্রাধান্য যেদিন মানিতে হয়; উপরের উপর—সকলের উপর—আর একজনের অস্তিত্ব সেদিন আপনিই আসিয়া পড়ে। পুত্র যখন বিদ্যমান, স্বীকার করিতেই হয়, পিতা-মাতা আছেন বা ছিলেন। এইরূপ, পিতার পিতা, তাঁহার পিতা, মানিতে মানিতে ঈশ্বরে গিয়া পর্য্যবশিত হয়। সেই শৃঙ্খলাই সকল শৃঙ্খলার মূল। ভিত্তিভূমে সে বিরাট্ স্তম্ভ দণ্ডায়মান না থাকিলে, এ সংসার-অট্টালিকা তিষ্ঠিত কি প্রকারে?

—— * ——

বিষয়—বস্তু লইয়া।

নাম ও বস্তু।

সামগ্রী এক, কিন্তু সংজ্ঞা অনেক। জল বল, 'পানি' বল, 'ওয়াটার' বল, পানীয় বল,—নাম বহুল; কিন্তু বস্তু এক। যে সংজ্ঞায় যে নামে অভিহিত কর, কিছুতেই কিছু আসিয়া যায় না; বিষয়—বস্তুত্ব লইয়া।

* * *

নাম অনন্ত, তিনি এক।

জগদীশ্বর—তাঁহার অনন্ত নাম। ব্রহ্ম বল, ঈশ্বর বল, 'গড' বল, 'আল্লা' বল, 'যিহোবা' যুহোবা' যেবা ইচ্ছা সংজ্ঞা দাও, কিছুতেই কিছু আসিয়া যায়

না; কেবল বুঝিবার প্রয়োজন—তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব। তাঁহার নাম অনন্ত বটে; কিন্তু তিনি সেই একই আছেন।

* * *

তৃষ্ণা ও পানীয়

পিপাসায় পানীয়ের জন্য প্রাণ যখন ব্যাকুল হয়, কেবল 'জল জল' বলিয়া চীৎকার করিলেই কি তখন পিপাসার শান্তি হয়? জল বা 'পানি' বা 'ওয়াটার' যে নামেই ফুকরাইয়া মর না কেন—কিছুতেই কিছু আসিয়া যায় না; জল যে বস্তু, যতক্ষণ তাহা পান করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তৃষার কোনই নিবৃত্তি পাইবে না।

* * *

স্বরূপ-তত্ত্ব।

ভগবৎ-সম্বন্ধেও সাধক জনের সেই উপদেশ। সংজ্ঞা লইয়া বৃথা দ্বন্দ্ব বাধাইলে কি ফল ফলিবে? যদি তাঁহাকে পাইতে চাও, সেই বস্তু পাইবার জন্য চেষ্টা কর; নাম লইয়া তর্ক বাড়াইও না। বিষয়—বস্তু লইয়া। আসল বস্তুটিকে কিসে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পার, কেবল সেই চেষ্টায় চেষ্টান্বিত হও। নচেৎ, সকল হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিই বৃথা হইবে।

* * *

সৎকার্য্যে।

তবে কথা এই, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়? বুঝিয়াছি, জল পান না করিলে পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভগবৎ-অনুকম্পা কিরূপে লাভ হয়? আমার মনে হয়—সৎকার্য্যের সমাধানে। তিনি সৎস্বরূপ; তাই সদনুষ্ঠানই তাঁহার সন্নিকর্ষ-লাভ। পৃথিবীর স্থূল দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই, ধনীর মিলন ধনীর সহিত, ধার্ম্মিকের মিলন ধার্ম্মিকের সহিত। সুতরাং সৎ-কার্য্যে সৎ-সম্পন্ন হইলে,

সংরূপের সমীপস্থ হইতে না পারিব কেন? মন!—সংকার্য্য করিয়া যাও? সৎ-স্বরূপ তিনি, সৎকার্য্যের আকর্ষণে অবশ্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে!

—— * ——

দেবতা।

দেবতা কাহারা?

তোমরা কেহ কখন দেবতা দেখিয়াছ কি? শৈশবে পিতামহীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া তন্দ্রা-ঘোরে নয়ন মুদিতে মুদিতে তাঁহাদের সম্বন্ধে কত কথাই শুনিয়া আসিয়াছি; আবার কৈশোর-কৌমার-যৌবনের জ্ঞানোন্মেষের—বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশের—সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের উপর তাঁহাদের কত চিত্রই প্রতিভাত হইয়াছে! কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না আজিও বুঝিতে পারিলাম না—দেবতা কাহারা?

* * *

দেবতার দর্শনে।

দেবতা কাহারা? তাঁহারা কোথায় আছেন? কি কাজ করেন? তাঁহাদের কিরূপ রূপ—কিরূপ প্রকৃতি? ভাগ্যহীন আমি, চিরজীবন খুঁজিয়া বেড়াইতেছি; ওগো!—আমাকে কেহ দেবতা দেখাইয়া দিতে পার? কেহ কহিতেছেন,—'কঠোর কৃচ্ছ্র তপঃসাধনা কর; কখনও অধোমুখে থাকিয়া, কখনও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কখনও অনশনে, কখনও একাশনে জীবন যাপন কর; দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।' কেহ বা কহিতেছেন,—'যজ্ঞ কর, আহুতি দেও, বার-ব্রত-নিয়ম মানিয়া চল, দেবতা দেখিতে পাইবে।' এইরূপ নানা জনের নানা উপদেশ—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিক্ষা।

* * *

দেবতা—প্রত্যক্ষ।

সত্যই কি দেবতার বসতি এত দূরে? সত্যই কি দেবতার সাক্ষাৎকার—এতাদৃশ আয়াস-সাপেক্ষ? আমার তো তাহা কখনও মনে হয় না। আমার মনে হয়,—এই সংসারে এই নরসমাজেই দেবতার প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি তো দেখিতে পাই,—এই মানুষই এই সংসারেই দেবতার আসন অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। নিরাশ্রয় অনাথ অভাগা অশ্রুপূর্ণলোচনে দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কে তিনি—যিনি অভাগার নয়ন-জলে আপন নয়ন-জল মিশাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লন? কে তিনি—যিনি পরের প্রাণরক্ষার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন? কে তিনি—যিনি সত্যের সরলতার ও মহত্ত্বের আধাররূপে অধিষ্ঠিত? সংসারে তাঁহারাই কি দেবতা নহেন? কর্ম্মগুণে এই মানুষই দেবতার আসন লাভ করেন। কর্ম্মেই দেবত্বের প্রতিষ্ঠা।

—— * ——

ভাণ্ডার উন্মুক্ত।

দয়ার ভাণ্ডার।

পুরোভাগে দয়ার অনন্ত ভাণ্ডার, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিয়ত আহ্বান করিতেছে,—"কাঙ্গালী নরনারী, কে কোথায় আছ, আইস, আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া ভাণ্ডার লুটিয়া লও;—অভাব মোচন কর।"

* * *

তৃষায় মরীচিকা।

কাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া দ্বারে দাঁড়াইতে সঙ্কোচ-বোধ হইতেছে? অথবা সংশয় আসিতেছে? তবে তৃষায় মরীচিকায় পুড়িয়া মর! আকাশে মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু দেখিতেছ—নানা-বর্ণানুরঞ্জিত

অতিবস্তৃত; কিন্তু জলবিম্ব ও জ্যোতিঃকণা ব্যতীত উহাতে আর কি আছে? সংসারও সেইরূপ।

* * *

কাঙ্গালী হও। তৃষ্ণায় মরীচিকা-দর্শন আর ইন্দ্রধনু—দুই সমান। উভয়েই বিচিত্রবর্ণ, কিন্তু শূন্য ও শূন্যাশ্রয়। বৃথা পশ্চাতে ছুটিয়াছ কেন? পিপাসা নিবারিত হইবে না; বরং পুড়িয়া মরিবে। তৃষা নিবারণ করিতে হইলে, কাঙ্গালী হইয়া যুক্তকরে ঐ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। উপায় সেই—উপায় একমাত্র। সকল ভুলিয়া তাঁর দুয়ারে দাঁড়াও। তিনি যে দীনতারণ! দয়ার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া আছেন।

—— * ——

কর্ম্ম-কথা।

সংসার কর্ম্মময়। সংসার নিয়ত কর্ম্মানুরত। কি মানুষ, কি প্রকৃতি, এ সংসারে কেহই ক্রিয়াশূন্য নহে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—প্রকৃতি কতই ভাঙ্গিতেছে, কতই গড়িতেছে; কিবা জাগরণে, কিবা সুষুপ্তি-যামে, মানুষেরও প্রাণে কর্ম্মের অবসান দেখি না। সংসার কর্ম্মময়।

* * *

প্রকৃতির কর্ম্ম। বিটপীর শুষ্কপত্র ঝরিয়া পড়িতেছে; আবার তাহা নবকিশলয়ে সুশোভিত হইতেছে। নদী প্রাবৃটাপগমে শীর্ণতোয় বালুকঙ্করসার হইয়া পড়িতেছে; আবার ভাদ্রের ভরাযৌবনে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত তরঙ্গভঙ্গময় অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। প্রকৃতির কর্ম্মই এই ভাঙ্গাগড়া।

* * *

অনন্ত কৰ্ম্মী।

কর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত সূর্য্যদেব, পরিদৃশ্যমান্ অনন্ত-কৰ্ম্মী তিনি। স্থূল-দৃষ্টিতেও তাঁহার বিরাম দেখিয়াছ কি কেহ? জগদীশ্বর যেন, জীবকে কর্ম্মশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে—কৰ্ম্মঠ করিবার জন্যই, সেই জ্যোতির্ম্ময় তরুণ-অরুণ-রূপে বিকাশ পাইয়াছেন। সেই জবাকুসুম-সঙ্কাশ মহাদ্যুতি, তাই বুঝি—পাপ-অন্ধকার-দূরকারী সর্ব্বপাপঘ্ন।

* * *

কৰ্ম্ম, পূর্ণতার প্রতি।

কৰ্ম্ম, উৎকর্ষের অনুসারী। স্রষ্টার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ-সাধনেই প্রকৃতি কৰ্ম্মানুরত নহে কি? যেদিক দিয়াই দেখি, উৎকর্ষের প্রতি কৰ্ম্ম পরি-ধাবমান; পূর্ণতা-সাধনই প্রকৃতির কৰ্ম্মান্তর্গত। সেই সূত্র ধরিয়া কৰ্ম্ম করিয়া যাইতে পারিলেই তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়া যায়।

* * *

প্রেমে কৰ্ম্ম।

মানুষের এই কৰ্ম্মসূত্র সরল করিবার অভিপ্রায়ে, শাস্ত্র ভগবানের একটী অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রেমময়—তিনি প্রেমস্বরূপ। তাই প্রকৃতির প্রতি—ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি—তাঁহার পূর্ণতার প্রতি—প্রেমানুরাগী হইয়া, মানুষ যে কৰ্ম্ম করিতে পারিবে, সেই কৰ্ম্মই শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিহিত। সেই কৰ্ম্মই ধৰ্ম্ম।

উপায়।

উপায় কি?

"আয়ু, উচ্চপাদপের কম্পিতপত্র-বিলম্বিত জল-বিন্দুর ন্যায় পতনোন্মুখ; শরীর, হরচূড়ামণি শশিকলার ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায় না; ভোগ-মাত্রই মেঘ-পটল-

মধ্য-স্ফুরিত সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল; জীবনের সুহৃৎ-সজ্জন-সমাগম বাগুড়া-বেষ্টন-সদৃশ; ক্রুর কৃতান্ত-মার্জ্জার সর্ব্বভূতরূপী মূষিক-কুল-ভক্ষণে ব্যগ্র; পতনের প্রাচুর্য্য প্রতিপদে;—এমন অবস্থায়, উপায় কি?—গতি কি?—আশ্রয় কি?"

* * *

ভগবৎ-প্রশ্ন।

ভগবান্ রামচন্দ্র, কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবকে এক দিন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কাম-ক্রোধাদিরিপুনক্রসঙ্কুল মোহাবর্ত্তচঞ্চল সংসার-সমুদ্রের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া, শিক্ষার্থীর ন্যায়, শিষ্যের ন্যায়, মুমুক্ষুর ন্যায়, তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! আমার উপায় কি? আমার গতি কি? রসরূপী রসপ্রদ পারদ অনলে পতিত হইলেও যেমন দগ্ধ হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানরসসম্পন্ন সংসারী সংসারানলে পতিত হইলেও কি উপায়ে দাহ হইতে অব্যাহতি পায়? হে ব্রহ্মণ!—সেই উপায় আমায় বলিয়া দেন।"

* * *

তত্ত্বজিজ্ঞাসু।

মহামতি বশিষ্ঠ দেব এই প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নোত্তর অবলম্বনে সুবিশাল যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ; তাঁহারই সেই প্রশ্নোত্তরের সার-ভূত তদন্তর্গত 'মুমুক্ষু-ব্যবহার প্রকরণ।' তিনি বলিয়াছিলেন,—'প্রথমে মুমুক্ষুর ন্যায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে, তৎপরে সদ্‌গুরুর নিকট শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রানুগত সদাচারী সদ্‌গুণসম্পন্ন হইতে হইবে, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; সৎকর্ম্ম-পরম্পরাই মনুষ্যের গতি-মুক্তির একমাত্র উপায়।' এক নিশ্বাসে রামায়ণ বর্ণনার ন্যায় মহর্ষির সেই বিশাল

বিস্তৃত দুর্ব্বোধ্য গূঢ়তত্ত্ব এক কথায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। যে তত্ত্ব বুঝিতে সাধনসম্পন্ন সদ্‌গুরুর নিকট বহুশিক্ষার প্রয়োজন, যে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আপনার অশেষ ধ্যান-ধারণা-সাধনার আবশ্যক, আমরা এতই পণ্ডিত হইয়াছি যে, দুই ছত্রে তাহার সংক্ষিপ্তসার বুঝাইয়া ফেলিলাম! হায় অহমিকা! এই অহমিকাই এখন এ জাতির কাল হইয়াছে! শাস্ত্রকার ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন,—'গতি-মুক্তির পথ-প্রার্থী হইলে, প্রথমেই মুমুক্ষুর ন্যায় তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে হইবে। পরে অপরাপর ক্রিয়া।' 'আমার উপায় কি হইবে?—আমার গতি কি হইবে?' মুমুক্ষুর ন্যায় এইরূপ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেই বা আমরা কবে শিখিব? সেই অভাবই এখন এ জাতির প্রথম অভাব। সেই অভাব দূর করাই এখন প্রথম প্রয়োজন।

---*---

পাপের ভার।

পাপের ভার।

সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, সকল ভার সহিতে পারেন; কিন্তু পাপের ভার বহিতে পারেন না। তাই পৃথিবী যখন পাপভারে অতি-ভারাক্রান্ত হয়, বসুমতী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া-ডুবিয়া জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়।

* * *

কেন বিপদ!

শান্তির সংসারে আধিব্যাধি শোকতাপ দৈব-দুর্ব্বিপাক,—কে আনে?—কোথা হইতে আসে? আজি ভূকম্পন, কালি জলোচ্ছ্বাস, পরশ্ব মহামারী;—এখানে বাত্যাবর্ত্ত, সেখানে দিগ্‌দাহ, দূরান্তরে আগ্নেয়-গিরির অগ্নিস্রাব; —কেন হয়?—কিসে ঘটে? কেহ বলিতে পার কি?

* * *

সহস্র দৃষ্টান্ত।

যখন দেখিতে পাই,—কি কারণে কনক-লঙ্কা পুড়িয়া গেল, কি কারণে হস্তিনা-ইন্দ্রপ্রস্ত লুপ্ত হইল, কি কারণে দ্বারকায় যদুবংশ ধ্বংস পাইল,—তখন কি আর অন্য প্রমাণ প্রয়োজন হয়? প্রাচ্যের দূর-অতীতের কথা পরিত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্যের ইতিহাস-পরিদৃষ্ট দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেই বা কি দেখিতে পাই? দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন 'পম্পি'-নগরীর অশেষ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। কিন্তু সেই পম্পির অন্তিম-কাহিনী একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি! বিসুবিয়স্ পর্ব্বতে আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হইয়া, সহসা অগ্নিস্রাবে নগরী প্রোথিত করিল। কেন, কোন্ পাপে, কাহারও মনে পড়ে না কি? মনে না পড়ে যদি, আজিও চক্ষু চাহিয়া দেখিয়া আইস,—পম্পির ভগ্নস্তূপ-মাঝে কি সব বীভৎস চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে!—পম্পি কি পাপে ভস্মীভূত হইয়াছিল, তাহার শত-নিদর্শন সেই কারু-কার্য্য-মাঝেই এখনও বিদ্যমান আছে।

* * *

পাপভারাক্রান্ত।

আবার সেদিন (১৩০৯ সালে) যে 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে 'মাউন্টপেলির' অগ্নিস্রাবের 'মার্টিনিক্' ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল, সহস্র সহস্র নরনারী অগ্নি-মুখে প্রাণ-বিসর্জ্জন দিল, তাহারও কোনও কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছ কি? মার্টিনিক্—পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিল, অপবিত্রতা ও অসৎ-কার্য্যে আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। ধরণী আর সহিতে পারিলেন না; তাই তাহাকে ক্রোড় হইতে ফেলিয়া দিলেন, মার্টিনিক্ ধ্বংসের পথে পতিত

হইল। 'লিডস' নগরীর একটী রমণী মার্টিনিকের বহু ব্যভিচারের বিষয় সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—তাহার নৈতিক অবনতি এত দূর গভীরতর পথে অগ্রসর হইয়াছিল যে, তাহারা ধর্ম্মের নামেও বিদ্রূপের নৃশংস আচরণ আরম্ভ করিয়াছিল; তাই তাহাদের ঐ শোচনীয় পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। তাহারা নিজে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও, খৃষ্টানের 'গুড্‌ফ্রাইডের' পবিত্র দিনে, খৃষ্টানের প্রভু যীশুর ক্রুশ-বিদ্ধ ঘটনায় বিদ্রূপ করিয়া, জীবন্ত শূকর-শাবককে 'প্রেক'-বিদ্ধ করিত, মস্তকে কণ্টক ফুটাইয়া দিত, কবরে প্রোথিত রাখিত, পরিশেষে 'ইষ্টার সাণ্ডে' দিবসে কবর হইতে তাহাকে উত্তোলিত করিয়া, বেশ-ভূষায় সাজাইয়া, ধর্ম্ম-পবিত্রতার প্রতি পরিহাস-পটুতায় পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইত। তাহাদের ধর্ম্ম-হীনতা ও নীতিহীনতার এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ ধর্ম্মের প্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাবে, এবং নৈতিক অবনতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনেই, মার্টিনিক্ ধ্বংসের পথে পতিত হইয়াছে,—ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ইহাই অভিমত।

* * *

শরণাগতের রক্ষা।

ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মানুরাগী হইতে পারিলে, কিসের ভাবনা—কিসের বিপদ? কাতর প্রাণে শরণাপন্ন হইলে, করুণাময় তিনি, কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? মার্টিনিকের অগ্ন্যুৎপাতে, দেখুন, সে দৃষ্টান্তও কেমন প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান্! প্রচণ্ড অগ্নিস্রাব আরম্ভ হইয়াছে; আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ধাতুনিঃস্রাব নির্গত হইতেছে; যোজন-যোজনান্ত জনপদ আর্ত্তনাদসহকারে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। 'মাউণ্টপেলীর'

আগ্নেয়-গহ্বরের অতি-নিকটে অবস্থিত 'মার্ণে রোঞ্জ' পল্লী; ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া ওঠে—পল্লীর তখন কি প্রাণভেদী দৃশ্য! কিন্তু ঐ পল্লীর একটী ধর্ম্ম-মন্দির-মাঝে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন! ঐ দেখুন, একদিকে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-নিসরণ; অন্যদিকে পল্লীবাসিগণ, ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া, নতজানু হইয়া করুণাময়ের করুণাভিক্ষা করিতেছে; অনুশোচনার অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া, তাহারা ডাকিতেছে,—"দীননাথ!—রক্ষা কর! পাপ-বিমোচন!—পাপ মোচন কর।" মর্ম্মভেদী কাতর আহ্বান!—ভগবান্ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন কি? তাই দেখুন, সেণ্টপেরির অগ্নিস্রাব, দূর দূরান্তে, ৩০ মাইল দূরে প্রবাহিত হইল; কিন্তু ধর্ম্মমন্দিরটি উল্লঙ্ঘন করিয়া গেল। শুনিয়া, শরীর কণ্টকিত হইতেছে না কি? চারিদিকের পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষ-লতা পর্য্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; কেবল ধর্ম্ম-মন্দিরটি এবং তদাশ্রয়ভূত আকুল-আর্ত্ত প্রাণী কয়টি রক্ষা পাইল;—কাতর প্রার্থনার পুণ্যপ্রদ ফল, ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? মানুষ!—এত দেখিয়া এত শুনিয়াও তোমার জ্ঞান হইল না?—এখনও তুমি দয়ার দ্বারে দাঁড়াইয়া আকুল প্রার্থনায় বিভোর হইতে পারিলে না।

—— * ——

বারিবিন্দুর ন্যায়।

বারিবিন্দু।

বারিবিন্দু মহাসাগরে মিলিতে চায়। তাই তটিনীর অঙ্গে আপন অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। সাগরগামিনী, কেমন বক্ষে ধরিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়াছেন!

* * *

অস্তিত্বে লীন।

মানুষ ঠিক সেইরূপ মিলিতে পারে না কেন? আপন অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্বে মিশাইয়া দিয়া জলবিন্দুর ন্যায় তাঁহাতে লীন হইবার চেষ্টা করে না কেন?

* * *

সৎকর্ম্মে।

তিনি সৎস্বরূপ। সৎকর্ম্মরূপ নদী, তদভিমুখে অবিরাম চলিয়াছে। সৎকর্ম্মানুপ্রাণিত বারিবিন্দু-স্থানীয় আমাদের প্রাণ, আমরা কেন তাঁহাতে মিশাইতে পারি না?

চাতক হও।

বারিবিন্দু।

বারিবিন্দুর আশায়, চাতক আকাশের পানে চাহিয়া আছে। 'ফটিক জল' 'ফটিক জল' করিয়া পাখী পাগল হইয়া গেল।

* * *

তৃষ্ণা দূর।

সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর পড়িয়া আছে; পদ-প্রান্তে নির্ম্মল-বাহিনী তটিনী কুলুকুলু বহিতেছে; অদূরে অতল জলনিধি, বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া আছেন; ক্ষুদ্র পাখীর—এত জলে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না?

* * *

মিটিল কৈ?

মানুষ! তুমি তো সংসার-সাগরে পড়িয়া নিয়ত হাবুডুবু খাইতেছ! তোমারই বা তৃষ্ণা মিটিল কৈ? বিকারের রোগী, যতই জলপান করিতেছ, তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে না কি? আজি ধন-তৃষ্ণা, কালি যশোলিপ্সা, পরশ্ব উচ্চ-পদাকাঙ্ক্ষা—তোমার পিপাসা মিটিবে কবে?

* * *

চাতক হও।

একবার চাতক হইয়া চাহিতে পার? বারি-বিন্দুর আশায়, একবার আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিতে পার? ধ্রুব, পঞ্চম বর্ষীয় শিশু, আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিয়াছিল—'কোথা ভগবান করুণানিদান!' তার তো পিপাসা মিটিয়াছিল! আহা!—বারিবিন্দু নয়—সে যে অমৃতবিন্দু! বিকারের রোগীর তাহাই উপযোগী। রোগের যাতনায়, দারুণ পিপাসায়, নিশিদিন ছট্‌ফট্‌ করিতেছ! প্রাণ!—একবার চাতক হইয়া আকাশের পানে চাহিতে পারিবে না?

—— * ——

বর্ষা আসিল কৈ?

বর্ষার প্লাবন।

বর্ষার প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে। বন্যায় দেশ বিধৌত হইতেছে। নদ-নদী তড়াগ-পুষ্করিণী আতট উছলিয়া উঠিয়াছে। ধরণী সুধাধারায় অভিসিঞ্চিত।

* * *

মেঘ উড়িল।

আবার দিগন্তে দৃষ্টি কর। মেঘ উঠিয়াছে। আকাশ কৃষ্ণকাদম্বিনী-সমাচ্ছন্ন। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকিতেছে। কড়কড় কুলিশ নিনাদিতেছে। সহসা প্রচণ্ড বায়ু বহিল। মেঘমণ্ডল খণ্ডখণ্ড উড়াইয়া দিল। বারি-বর্ষণ হইল না। তবে উপায় কি হইবে?

* * *

আমার হৃদয়ে।

কেন বারিবর্ষণ হইল না? আমার হৃদয়-মরুভূমে, ক্বচিৎ কৃষ্ণকাদম্বিনীর সঞ্চার হয়, ক্বচিৎ বিদ্যুৎ চমকায়, ক্বচিৎ কুলিশ-নিনাদ শুনা যায়। কিন্তু কেন বারি-বর্ষণ হয় না? দুশ্চিন্তা-বায়ু!—তুই সব উড়াইয়া লইয়া গেলি?

বিন্দু বিন্দু বাষ্প-সঞ্চারে, একটু একটু মেঘের সঞ্চার হয়। প্রচণ্ড বায়ু!—তুই অমনি তাহা উড়াইয়া দিস্!

* * *

উপায় কি?

তবে উপায় কি হইবে? এ মরুমাঝে কখনও কি ঘনমেঘের সঞ্চার হইবে না? বর্ষার প্লাবনে ধরণী পরিপ্লাবিত হয়; আমার প্রাণে কি প্রেমের প্লাবন একবার বহিবে না? কোথা দীননাথ!—তোমার করুণার সুধাধারায় একবার এ প্রাণ অভিষিক্ত কর। এ শুষ্ক প্রাণে তোমার প্রেমের পীযুষ-প্রবাহ একবার প্রবাহিত হউক। সে প্রবাহে অধম তরিয়া যাক।

—— * ——

পাগল হও—পাগল হও!

অভাব।

একটা জিনিষের একান্ত অভাব। সেই ব্যাকুলতা—সংসারের সকল কার্য্যে আছে; বিদ্যার্জ্জনে, অর্থোপার্জ্জনে, সুখ-সম্পদ্-বর্দ্ধনে, পুত্র-পরিজন প্রতি-পালনে,—ব্যাকুলতা কোথায় নাই? কিন্তু নাই—নাই কেবল ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা; নাই—নাই কেবল ভগবৎ-অন্বেষণে ব্যাকুলতা। নাই—নাই কেবল সদনুষ্ঠানে ব্যাকুলতা!

* * *

স্বর্গের সুষমা।

কলনাদিনী কালিন্দী, দুকূল প্লাবিত করিয়া, কলকল্লোল তুলিয়া চলিয়াছে। পূর্ণিমার প্রস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ নীলজলে, মণি-মরকত-শোভা বিখচিত করিয়াছে। তীরে তাল-তমাল-তরুরাজি, তৃষিতের ন্যায় চাহিয়া চাহিয়া, হতাশ গণিতেছে। সহসা নিধুবনে কদম্বমূলে

বাঁশরী বাজিল! মজিল রে,—যমুনা মজিল! উন্মাদিনী উজান বহিয়া ফিরিয়া আসিল। কল্পনা!—স্বর্গের সুষমা দেখাইলি তুই!

* * *

পাগল হই কৈ?

আবার দেখি,—সম্মুখে সোণার পুতলি স্নেহের-নন্দন, পদপ্রান্তে পতিগতপ্রাণা সাধ্বী সতী গোপা;—দূরে কে যেন ডাকিতেছে,—"সিদ্ধার্থ! ফিরিয়া এস; সম্মুখে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র।" রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্নেহ, মমতা;—সব দূরে পলাইল; জীবের জন্মজরামৃত্যু দূর-কামনায়, রাজপুত্র সংসারত্যাগী হইলেন! দৃষ্টি!—আরও নিকটে এস!—ঐ দেখ, নবদ্বীপের গৌরচন্দ্র, প্রতিভার পূর্ণচন্দ্র, ব্যাকুলতার কি আদর্শে, কৃষ্ণ-প্রেমে পাগল হইয়া গেলেন! সেই বাঁশী, সেই আহ্বান, সেই আদর্শ,—সকলই সম্মুখে রহিয়াছে! প্রাণ!—এখনও পাগল হইতে পারিলে না?

ছায়া ও আলো।

ছায়া।

ছায়া!—ছায়াময়! দূরে—যতদূরে পিছাইয়া পড়ি, ছায়া!—ছায়াময়! ক্ষুদ্র ছায়া—ক্ষীণরেখা—সেই তখন বৃহৎ বৃহত্তর বৃহত্তম আকার ধারণ করে; ছায়া—আঁধার, অমার আঁধার, অনন্ত আঁধারে পরিণত হয়। মধ্যাহ্ন-তপন—জ্যোতিষ্ক-জীবন—মন্থর-গমনে সান্ধ্য-গগনে বিলীন হইলেন; সংসার পশ্চাতে পিছাইয়া পড়িল; ছায়া—বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম। আবার—উষার নব-রাগ-রঞ্জিত পূর্ব্বাশার দ্বারে, অরুণের কাঞ্চন-কান্তি বিভাষিত হইল। সেই আঁধার—বিশ্বব্যাপী ছায়া—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম আকার ধারণ করিল। মধ্যাহ্ন-সমাগমে জ্যোতিষ্মান্-সামীপ্যে, সেই ছায়া—সেই আঁধার—ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম।

পাপে—ছায়া। ছায়া-রূপী পাপ। পাপ-রূপী ছায়া। পশ্চাতে পশ্চাতে প্রতীক্ষা করে। আলোক-রূপী ভগবান, কারুণ্যপ্রাণ করুণানিদান, পাপ-পঙ্ক-পতিত প্রাণীর—সেই ছায়ার আঁধার দূর করিবার জন্য, আলোক-রশ্মি-রূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার আবির্ভাবে ছায়া পিছাইয়া পড়ে। ছায়া—ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম কায় পরিগ্রহ করে। কিন্তু মানুষ—অবসাদ-গ্রস্ত মানুষ—সে কেন আলোকের নিকটে থাকিতে পারে না? কেন সে পিছাইয়া পড়ে? ছায়া—সে কি তারে আকর্ষণ করে? তাই কি ছায়া—ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম ছায়া—বিশ্বব্যাপী অনন্ত আঁধারে পরিণত হয়?—আর মানুষকে সেই অনন্ত আঁধারে আবরিত করিয়া ফেলে।

* * *

পুণ্যের জ্যোতিঃ। পাপ, আকর্ষণ করিতেছে—ছায়ার দিকে টানিতেছে! ছায়া—যেন সঙ্কোচক সম্প্রসারক স্থিতিস্থাপক। ছায়া পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ছিল, বৃহৎ হইল; ক্ষীণ ছিল, গুরুত্ব পাইল। পাপে-ছায়ায় এই সম্বন্ধ। জ্যোতির জ্যোতিঃ—উজ্জ্বলতার কৌস্তুভ-মণি—আলোকের পবিত্র-রশ্মি—মনুষ্যের পুণ্যস্থানীয়। অরুণোদয়ে কুহেলিকা অপসারণের ন্যায়, পুণ্য-পথের আঁধার-ছায়া পুণ্য-প্রভায় অপসৃত হয়। কে যেন আপনিই পথ দেখাইয়া দেয়! যে অনুসরণ করে, পুণ্যের সন্নিকটে—আলোক-সান্নিধ্যে অগ্রসর হয়; সেই তো ছায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করে! আঁধার—অনন্ত আঁধার—তাহাকে আর গ্রাস করিতে পারে না।

পাপ ও পুণ্য।

পাপ ও পুণ্য।

ছায়া ও আলোকের তুলনায়, পাপ-পুণ্যের স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। পাপের প্রগাঢ়তায়, ছায়া ঘনীভূত—ঘোর অন্ধকারে পরিণত। পুণ্যের পূর্ণবিকাশে, আলোকের উজ্জ্বল-রশ্মি-সম্পাতে, অন্ধকার অন্তরিত—ছায়া অপসৃত। তাই বলিতেছিলাম, পাপ-পুণ্যের অতি উপযোগী উদাহরণ—ছায়া ও আলোক। মানুষ যতই আলোকের নিকটে থাকে, ছায়া—ততই ক্ষীণ, ততই সুপ্ত, ততই লুপ্ত। মানুষ যতই আলোক হইতে দূরে পড়ে, ছায়া ততই প্রগাঢ়, ততই ঘনীভূত। আলোকের প্রতি যখন মানুষের ঐকান্তিক লক্ষ্য থাকে, মানুষ যখন আলোককে সম্মুখে রাখিয়া একান্তে তৎপ্রতি অগ্রসর হয়, ছায়া আপনিই পশ্চাতে পিছাইয়া পড়ে। আবার, মানুষ যখন আলোকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, আলোকের প্রতি পশ্চাৎ ফিরিয়া বিপরীত-মুখে অগ্রসর হয়, ছায়া অমনি সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। এইরূপ, আলোক যখন মস্তকের উপর, আলোক যখন ব্রহ্ম-রন্ধ্রে, ছায়া পদতলে বিলুণ্ঠিত, ছায়া পলায়িত।

* * *

অপূর্ব্ব সাদৃশ্য।

পাপে ও পুণ্যে, ছায়ায় ও আলোকে—এই অলৌকিক সৌসাদৃশ্য! ভক্তকবি তুলসীদাস, একটি সুন্দর দোঁহায়, ঠিক এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ছায়া ও পাপ না বলিয়া, তিনি বলিয়াছেন—ছায়া ও মায়া। কেবল প্রতিবাক্যের পার্থক্য! তিনি বলিয়াছেন,—'ভগবান্ রামচন্দ্রকে যখন হৃদয় হইতে দূরে রাখি, মায়া বৃদ্ধি পায়; তিনি যখন হৃদয়ে থাকেন, মায়া পলায়ন করে। সূর্য্যদেব দূরে থাকিলে

ছায়া বৃদ্ধি পায়; তিনি যখন মস্তকে থাকেন, ছায়া পদতলে বিলুণ্ঠিত হয়।' * বলিয়াছি তো—সেই ভাব, সেই দৃষ্টান্ত, সেই অভিব্যক্তি! পার্থক্য—কেবল প্রতিবাক্যের। মায়া!—মায়া কি? অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়া—সেই তো সকল পাপের মূল! যেই পাপ, সেই মায়া, সেই অবিদ্যা। তবে আর পার্থক্য কি? তাই বলি, ছায়া ও আলোকে—পাপ ও পুণ্যে—যেন কি নিকট-সম্বন্ধ!

—— * ——

অতীত ও বর্ত্তমান।

সম্বন্ধ।

জানি না—অতীতের সহিত বর্ত্তমানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? জানি না—নূতনের সহিত পুরাতনের কোনও সংশ্রব ছিল কি না? জানি না—এই নূতন 'আমি' কোনও পুরাতন 'আমির' সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত ছিলাম কি না? ঘোর প্রহেলিকা! দুর্ভেদ্য অন্ধকার! কল্পনার সীমা-রেখা—অনন্ত প্রসারিত। কচিৎ অস্পষ্ট আব্ছায়া; কচিৎ অস্পষ্ট স্মৃতি-রেখা! কে জানে কি সমস্যা! দূরে, অতিদূরে, অতীতের গাঢ় অন্ধকারে, বিস্মৃতির বিস্তৃত ব্যবধানে—ক্ষণিক বিদ্যুৎবিকাশ—স্মৃতির ক্ষীণ-স্ফূর্ত্তি! যাহাকে কখনও দেখি নাই, যে আমায় কখনও দেখে নাই, তাহার প্রতি এ আকর্ষণ কেন? কোন্ জীবনে কোন্ বার দেখিয়াছি—দেখিয়াছি কি না তাহারও নিশ্চয়তা নাই; তবু কেন আকৃষ্ট হই? আরও তো কত জনে কত বার দেখিয়া থাকি; কৈ, তাহারা তো আমায় চায় না!—আমিও তো তাদের অনুরাগী নই! আমি পৃথিবীতে পদার্পণ

---

* তুলসীদাসের সেই উক্তি,—
"রাম দূরী মায়া বঢ়তি, ঘটতি জান মন-মাহ।
ধুরী হোতি রবি-দূরী লখি, শিরপর পগতর ছাঁহ।"

করিবার কত পূর্ব্ব হইতে কত জনের কত ভালবাসা স্তূপে স্তূপে আমার জন্য সজ্জিত থাকে। তাহারা তো আমায় কখনও দেখে নাই! আমিও তো তাদের কখন দেখি নাই! দেখিয়াছি কি না—প্রমাণও তো কিছু নাই! তবে কেন এ অনুরাগ?

* * *

আত্মজন। আপনার জন! কে আমার আপনার জন? যারে দেখি নাই, যে আমায় একবার দেখে নাই, সে কি আমার আত্মজন? সংসারে বহুদিন একত্রে বাস করিতে করিতে, বহুদিন আলাপ-পরিচয় হইতে হইতে, আত্মীয়তা-অনুরাগ স্থাপিত হয়। কিন্তু সে আত্মীয়তা—সে অনুরাগ—কি প্রকারে সঞ্চিত হইল? কোন্ দূরদেশে—কোথায় আছে সে, কোথায় আছি আমি, সে কেন আমায় চায়—আমি কেন তার এত অনুরাগী? দেখি সংসার—দেখি সংসারের বিধি-বিধান! সে ক্ষেত্রে কেন সে বিধির ব্যত্যয় দেখি? পর কেন আপনার হয়? যারে দেখি-নি কখনও, কি দেখেছি কোন্ কালে—স্মরণ নাই, সে কেন আপনার হয়? জানি না—কে সে! জানি না—কে আমি! জানি না—কোথাকার কোন্ সম্বন্ধ?

* * *

সমস্যা। দূর দূরান্তরে, অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে—কত যেন পরিচিত স্থান—কত যেন পরিচিত জন! যে দেশে কখনও আসি নাই; সেই দেশ, সেই লোক, কেন পরিচিত-রূপে প্রতীত হয়? স্বপ্নাবেশে, কল্পনা-বশে, কত অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত বন্ধুর প্রতিচ্ছায়া দর্শন করি; সময়ে যদি কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ পাই, সেই স্বপ্নদৃষ্ট কায়া, সৌসাদৃশ্যে মিলিয়া যায়।

কেমন করিয়া সাদৃশ্য মিলিল, কি প্রকারে সেই মূর্ত্তি কল্পনা-চিত্রে প্রতিভাত হইল,—কেহ বলিতে পার কি? একটি নয়, দুইটি নয়, জীবনে এমন বহু সমস্যা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু কে তারা, কেন এমন হয়,—কেহ কি আমায় বুঝাইতে পার?

* * *

প্রত্যক্ষ।

এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি—একটি অপরিচিত অদৃষ্টপূর্ব্ব অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার মনে হইয়াছিল—সে বাড়ী যেন তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখিয়াছেন। বাড়ীর অন্দরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠটি,—যেন তাঁহার বহু দিনের পরিচিত। ঠিক এইরূপ আর একটি ঘটনা, আর এক বন্ধু লিখিয়া গিয়াছেন। বন্ধু, পুলিশবিভাগের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বলেন,—"আমি তদারকের জন্য * * পল্লীর একটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ঐ বাড়ীতে আমি জীবনে কখনও পদার্পণ করি নাই। অথচ, আমার মনে হইল, বাড়ীর অন্দর-মহল—যেন আমার পূর্ণ-পরিচিত। বাড়ীর বাহিরংশ কিন্তু আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীত হইল। কৌতূহল-পরবশ হইয়া, গৃহস্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম,—বহির্ব্বাটি পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। বাড়ীর একটি বৃদ্ধকে দেখিয়া, আমার বড়ই ভক্তি হইল। কথায় কথায়, বৃদ্ধের সন্তান-সন্ততির কথা উঠিল। বৃদ্ধ আক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—'তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়স্ক একমাত্র পুত্র, আজ ৩৬ ছত্রিশ বৎসর হইল, পরলোক-গমন করিয়াছে। সেই অবধি, তাঁহার আর কোনও পুত্র-সন্তান জন্মে নাই।' বৃদ্ধ, আমার মুখপানে তাকাইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমারও মনে, কি জানি কি এক অস্ফুট স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। পৌরাণিক-প্রসঙ্গে, ঋষি-তপস্বীর ত্রিকাল-দর্শন-প্রভাবে, এমন শত শত কাহিনী—বহু দিবস হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া আসিতেছি। ক্ষুদ্র জীবনে, বিস্মৃতি-বিহ্বল প্রাণে, তাহার রশ্মিমাত্র অবশিষ্ট আছে। জানি না—সেই রশ্মি, পূর্ব্বস্মৃতি কিনা! জানি না—কি সম্বন্ধে কাহার প্রতি কি অনুরাগ কেন সঞ্চিত হয়! জানি না—অতীতে ও বর্ত্তমানে কি সম্বন্ধ!

—— * ——

সত্য পথ।

সত্যে।

প্রাণে ধর্ম্মভাবের উন্মেষণে সত্য-পথের অনুসরণ প্রথম প্রয়োজন। সত্যের আলোক লক্ষ্য করিয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইলে, স্বতঃই সত্যস্বরূপের সন্নিকর্ষ-লাভ সংঘটিত হইবে। তবে সতর্ক থাকিতে হইবে—যেন বিভ্রম না ঘটে! জ্যোতির্ম্ময় দিনদেব কুজ্ঝটিকা-মেঘে সমাচ্ছন্ন হইলে, সময় সময় মূঢ়-মনে তাঁহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। সত্য-পথেও তদ্রূপ অসত্যের অজ্ঞানের তিমির-জাল সর্ব্বদা ঘনীভূত হইয়া আছে। সেই ধাঁধায় মানুষ অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়;—সত্যের পথে চলিতে চলিতে অসত্যের অজ্ঞানের পথে ঘুরিয়া মরে।

* * *

সত্য-তত্ত্ব।

সত্যের স্বরূপ-তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য, অসত্যের অন্ধকার হইতে সত্যের জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষীভূত করাইবার জন্য, দর্শন-শাস্ত্রের গভীর গবেষণা। দর্শন-শাস্ত্রে যে প্রমাণপরম্পরার সমাবেশ, এক হিসাবে যাহা দর্শন-শাস্ত্রের ভিত্তি-স্বরূপ,—সেই প্রমাণ-পরম্পরার অবতারণার

মূল উদ্দেশ্য কি? দর্শনশাস্ত্রোক্ত প্রমাণসমূহের বিবৃতি—সত্য-তত্ত্ব উদ্ধারে সহায়তা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। দৃষ্টিশক্তি বিভ্রান্ত হইতে পারে। বিভ্রান্ত দৃষ্টি-শক্তির ত্রুটি-হেতু মানুষ রজ্জুতে সর্প-দর্শন করে। শাস্ত্র তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দর্শন-শাস্ত্র-মতে প্রমাণ তাই বিবিধ;—প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি অনেক।

* * *

ভ্রান্তি।

বর্ষার বারিধারা বালুকা-ক্ষেত্রে পড়িয়া উবিয়া যায়; ক্ষুদ্র সরিৎ সাগরোদ্দেশে ছুটিতে ছুটিতে অর্দ্ধপথে অবসন্ন হয়; স্বচ্ছ নির্ঝরিণী পার্ব্বত্য-প্রদেশের বাধা-বিপত্তিতে পড়িয়া ঘুরিয়া মরে। সত্যের অন্বেষণেও মানুষের সেই বিড়ম্বনা। কোন্ পথে কীদৃশ উপায়ে সত্য অধিগত হয়—স্থির করিতে না পারিয়া, মানুষ অনেক সময় বিড়ম্বিত হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের কত সুপথ থাকিতে, জ্ঞান-বিবেক-শাস্ত্র-সমষ্টির কত অনুশাসন বিদ্যমান থাকিতে, অধর্ম্মের অকর্ম্মের পথে বিভ্রান্ত হইয়া মানুষ সত্যের অনুসন্ধান করিতে চায়। ভ্রান্ত মন, পাপ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে চায়; অপকর্ম্মী, অপকর্ম্ম করিয়া সুখী হইতে চায়; দস্যু—দস্যুবৃত্তি দ্বারা, নরহন্তা—নরহত্যার দ্বারা, সুখ-স্বরূপ সত্যস্বরূপ ভগবানের সন্নিকর্ষ-লাভের অভিলাষী হয়! মানুষের কি ভ্রান্তি!—কি মোহ!

* * *

সহায়।

সত্য-পথে প্রধান সহায়—সদ্‌গুণরাশি। যিনি সদ্‌গুণে গুণান্বিত, তাঁহার গুণসমষ্টি তাঁহার গন্তব্যপথে সহায়-রূপে বিদ্যমান থাকে। তুমি দয়াবান হও, তুমি

ন্যায়পর হও, তুমি সরলতা-সম্পন্ন হও, সত্যপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে তোমার কোনই বিঘ্ন ঘটিবে না। দয়া, সরলতা, ন্যায়, নিষ্ঠা প্রভৃতি সত্যের এক একটী অঙ্গস্বরূপ। সংসারী ক্ষুদ্র-প্রাণী, একেবারে ধ্যান-ধারণার কঠোর সাধনায় তন্ময়ত্ব লাভ না করিতে পারি, দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদনুষ্ঠান দ্বারাও সে পথে অগ্রসর হইতে পারি না কি? মানুষের কি অধঃপতনই ঘটিয়াছে! সত্যপথ দুরধিগম্য বলিয়া আমরা বিপথে অগ্রসর হইতেছি! যে সদ্‌গুণ-সমষ্টি সত্যপথে সহায়, একে একে সেগুলিকেও বিদায় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! তাই এত অধঃপতন!

—— * ——

জ্ঞান-রত্নাকর।

জ্ঞান-রত্নাকর।

'আমি, বালকের ন্যায়, বেলা-ভূমে বসিয়া, উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি; মহান্ জ্ঞান-রত্নাকর, পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে!'—পৃথিবীর গৌরবস্থানীয় মনস্বী স্যার আইজক্ নিউটন, মৃত্যুকালে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। জ্ঞান-রত্নাকর এতই দুর্লভ—এতই দুরধিগম্য।

* * *

বহুদূরে।

আমরা জ্ঞান-গরিমায় স্পর্দ্ধাবান্ হই। অথচ, জ্ঞান-রত্নাকরের কত দূরে পড়িয়া আছি! কত যোজনের পথে সে রত্নাকর অপেক্ষা করিতেছে,—আমরা তাহার কিছুই জানি না; অথচ, আমাদের কতই অহঙ্কার! আপনি জানি না, অপরকে জানাইতে যাই; আপনি চিনি না, অপরকে চিনাইতে যাই; ইহার অধিক মূঢ়তার নিদর্শন আর কি হইতে পারে?

* * *

অগ্রসর হও।

সকলেই উপদেষ্টা, সকলেই পথ-প্রদর্শক, সকলেই গুরুপদারূঢ়! অথচ, কেহই পথ পরিজ্ঞাত নহে। শিক্ষায় এই ভাব, সমাজে এই ভাব, ধর্ম্মে এই ভাব। মানুষ, কত দূরে পিছাইয়া রহিয়াছে, একবার তাহা চিন্তাও করে না; অগ্রসর হইবার জন্যও, একবার চেষ্টান্বিত হয় না। এই মানুষ! এই অবস্থাপন্ন! এ মানুষের আর জ্ঞান-রত্নাকর-লাভ হইতে পারে কি? আত্মম্ভরিতার লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ রহিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, রত্নাকর সরিয়া আসিবে না। একপ্রাণ হইয়া, এক মনে, এক ধ্যানে, অগ্রসর হইতে হইবে। অগ্রসর হইতে না পারিলে, ক্রমাগত অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিলে, সেখানে পৌঁছান যায় না। যদি জ্ঞান-রত্নাকর লাভ করিতে চাও, দেখ, পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও।

—— * ——

মানস-যোগ।

মন—চঞ্চল।

চঞ্চল মন—চপলার চকিত চমক। মদোন্মত্ত বারণ, বারণ মানিতে পারে; ক্ষণপ্রভায়, ক্ষণ-স্থৈর্য্য অসম্ভব নহে; কিন্তু মন কখনও স্থির থাকিতে পারে না। জীবনের নিত্য-কর্ম্মে, চাঞ্চল্যের অবধি নাই। গভীর নিশীথে সুষুপ্তির সুখ-শয়নে—মন তখনও বিশ্রামশূন্য। দিনান্তে একবার, অষ্টপ্রহরের মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র, ইষ্টদেবের চরণ স্মরণ করিব। তখনও সহস্র বিঘ্ন!—সংসারের শত কুটচিন্তা, একে একে, বদন ব্যাদান করিয়া, মনকে গ্রাস করিতে উপস্থিত! দিনান্তে সেই এক মুহূর্ত্ত—মন ততটুকু সময়ও চাঞ্চল্যশূন্য নহে।

* * *

কার্য্য চায়।

মন, কার্য্য চায়; কিন্তু কোনও কার্য্যেই পরিতৃপ্ত নয়। মন চিন্তাপূর্ণ; কিন্তু কোনও চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত নহে। মন অনুসন্ধিৎসু; কিন্তু অনুসন্ধানের সামগ্রী যেন অন্বেষণ করিয়া পাইতেছে না। সংসারের যেদিকে দেখি, সকলেই সমভাবাপন্ন। ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, প্রৌঢ় যুবক, স্ত্রী পুরুষ, সকলেরই এক ভাব। সকলেরই মন, কর্ম্মের অন্বেষণে ঘুরিতেছে। সকলেরই মন, পরিতৃপ্তির আশায়, ছুটিয়া বেড়াইতেছে। সকলেরই মন, কি যেন কি অমূল্য রতন, অনুসন্ধান করিতেছে। কিন্তু কোথায় কর্ম্ম, কোথায় পরিতৃপ্তি, কোথায় সে চির-আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভ রত্ন! মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, মানুষ দিশাহারা, মানুষ জ্ঞানশূন্য!

* * *

ভৃত্যের কর্ম্ম।

কি প্রকারে এই উদ্‌ভ্রান্ততা দূর হইতে পারে? এইখানে সেই প্রভুপরায়ণ কর্ম্মঠ ভৃত্যের কথা মনে পড়িল। কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার সময়, প্রভুর সহিত ভৃত্যের বন্দোবস্ত ছিল—ভৃত্য অষ্টপ্রহর-মধ্যে কখনও বিশ্রাম করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে প্রভুও, ভৃত্যকে অষ্টপ্রহর কর্ম্ম যোগাইবার জন্য, প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন। দিন যায়—ভৃত্য সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে। ক্রমে এমন হইল—প্রভু আর কর্ম্ম যোগাইতে পারেন না। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হয় দেখিয়া, তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে এক দিন, তাঁহার গুরুদেব উপস্থিত। শিষ্যকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া, কারণ জানিতে চাহিলেন। আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া, ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন,—"তুমি মনিব। তুমি যে কার্য্য করিতে দিবে, ভৃত্য তাহাই করিতে বাধ্য। তবে কেন তুমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইতেছ?" অতঃপর গুরুদেব, একটি

লৌহ-দণ্ডের কিয়দংশ মৃত্তিকা-প্রোথিত করাইয়া, সেটিকে মৃত্তিকোপরি ঋজুভাবে দণ্ডায়মান রাখিতে বলিলেন। তৎপরে ভৃত্যের প্রতি আদেশ হইল, ক্রমাগত তাহাকে সেই লৌহ-দণ্ডের উপরে উঠিতে হইবে ও নামিতে হইবে। দিনরাত্রি তাহার জন্য এই কার্য্য নির্দ্দিষ্ট রহিল। এখন, ভৃত্যেরও আর কার্য্যের অভাব নাই, প্রভুও প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দায়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

* * *

মনের ভৃত্যত্ব।

মন সেই ভৃত্যস্থানীয়। মনকে কার্য্য দিতে হইবে। এমন কার্য্য—যে কার্য্যে সে অবসর না পায়। ঠিক তেমন কার্য্য যিনি দিতে পারেন, তিনিই মনকে আয়ত্ত রাখেন। তাঁহারই মন চাঞ্চল্যশূন্য। ধ্যানমগ্ন মহাযোগী, মনকে কার্য্য দিতে পারিয়াছেন—যে কার্য্য হইতে মনের আর ফিরিবার অবসর নাই। মনকে যদি স্থির করিতে হয়, তবে তেমনই কার্য্য দিতে হইবে। কিন্তু সে কার্য্য কি? কিরূপে সে কার্য্য দিতে পারি? কত ধ্যান-ধারণা-সাধনা-প্রভাবে, তাঁহারা মনকে মনের-মত কার্য্য দিতে পারিয়াছেন। আমাদের কি আছে!—আমরা কি করিতে পারি! সেটুকুও কি পারি না? ভৃত্যকে কার্য্য দিবার জন্য, মৃত্তিকা-ক্ষেত্রে লৌহদণ্ড দণ্ডায়মান রাখাইতে পারি। সেইরূপ, মনকে কার্য্য দিবার জন্য, হৃদয়-ক্ষেত্রে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না কি? ভৃত্যের কার্য্য ছিল—তাহাকে দণ্ডের উপর ক্রমাগত উঠিতে নামিতে হইত। মনের কার্য্য হউক না কেন—সেই হৃদি-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডপতির আপাদ-মস্তক অবিরত সন্দর্শন। চঞ্চল মন, স্বভাব-বশে এক স্থানে স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং একবার চরণ-কমলে, একবার মুখমণ্ডলে,

পর্য্যায়ক্রমে তাহাকে দৃষ্টি করিতে শিক্ষা দাও। দেখিতে—দেখিতে—দেখিতে, আর ফিরিতে পারিবে না। তখন আর তাহার, কার্য্যেরও অভাব হইবে না; চাঞ্চল্যও দূরে যাইবে। মনঃস্থৈর্য্য, সর্ব্বকার্য্যে প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত ভগবচ্চরণ-লাভের উপায়ান্তর আদৌ নাই। তাই বলি, যদি ভগবচ্চরণ-প্রয়াসী হও, যদি মনঃ-স্থৈর্য্যের আবশ্যকতা অনুভব কর, তবে হৃদয়-ক্ষেত্রে সেই মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া, লৌহদণ্ডে-নিযুক্ত ভৃত্যের ন্যায়, মনকে তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত কর। মন, একবার দেখুক—সেই ভ্রমরগুঞ্জিত চরণ-কোক-নদে কত আনন্দ—কত সুধা! আবার দেখুক—সেই অরুণ-কিরণ-বিভাত জ্যোতিঃ-মূর্ত্তির দিব্য-জ্যোতিঃপ্রভা!

—— * ——

প্রাণ যা চায়!

প্রাণ কি চায়।

প্রাণ যেন কি চায়! সংসারে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই; কৈ, প্রাণ ত তাহাতে পরিতৃপ্ত নয়! শারদ-শশীর সুধামাখা স্নিগ্ধ কিরণ-জালে, জগৎ উদ্ভাসিত—যামিনী পুলকিত; কৈ, আমার প্রাণে তো সে আনন্দের সঞ্চার হয় না! এই বিরাট্ বিশ্বের বিশাল বক্ষে বৈচিত্র্যের বিজয়-পতাকা চতুর্দ্দিকে উড্ডীয়মান্ রহিয়াছে; কিন্তু প্রাণ তাহা দেখিয়াও দেখে না! অথচ, সদাই কি যেন খুঁজিয়া বেড়ায়! প্রাণ যেন অন্য কি চায়!

* * *

আকাঙ্ক্ষা।

অভাবে আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিই তৃপ্তি। আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইলেই সুখ। অভীষ্ট সিদ্ধ হইলেই আনন্দ। বাসনা-চরিতার্থ-জন্যই যেন দিবারাত্রি সংসার

পাগল। কিন্তু এই নশ্বর জীবের কামনার নিবৃত্তি নাই—প্রবৃত্তিরও অভাব নাই। একটি ফুরাইল; অমনি আর একটি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিল। বাত্যা-বিক্ষোভিত বিশাল বারাধি-বক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা যেমন একের পর একটি পর্য্যায়ক্রমে গড়িতেছে ভাঙ্গিতেছে; মানবের হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষারও সেইরূপ লীলাখেলা। হৃদয় বাসনায় বিজড়িত—আকাঙ্ক্ষায় উচ্ছ্বলিত। তাই তৃপ্তি নাই, তাই প্রাণ যেন সদাই কি নূতন চায়!

* * *

অশান্তি।

প্রাণের প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি?—শান্তি। মানুষ শান্তির কাঙ্গাল। কিন্তু শান্তি কোথায়? রিপুচয়ের তাড়নায়, সংসার ছাড়িয়া, শান্তি অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছে। হিংসা-দ্বেষ মানুষের নিত্য-সহচর—স্বার্থপরতা তাহার পথ-প্রদর্শক। যেদিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে—মানুষ যেন সদাই কাহার অনুসরণ করিতেছে! সাধারণ দৃষ্টিতে তুমি সে রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুভব হইবে। তখন বুঝিবে—তাহার উদারতার অন্তরালে স্বেচ্ছার স্বার্থপরতা লুক্কায়িত। যাহা প্রথমে তোমার চক্ষে সুবর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, দেখিবে—উহা কষিত পিত্তল বা শ্যামিকা মাত্র, সমস্তই যেন যাদুকরের ভেল্‌কী।

* * *

অন্ধকার।

সর্ব্বত্র অন্ধকারের ভীষণ বিভীষিকা! স্তরে স্তরে তমোরাশি সজ্জীকৃত! ঘোর ঘনঘটা-চ্ছন্ন রজনীতে বিদ্যুৎ-বিকাশের ন্যায়, যদিও কচিৎ কোথাও শান্তির বিমল জ্যোতিঃ নয়নগোচর হয়, উহাও অচিরাৎ কোথায় মিশিয়া

যায়! যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার! চঞ্চল চপলার চকিত চমকে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে তমোরাশি, ভীষণ হইতে ভীষণতর ভ্রূকুটি-ভঙ্গি দেখায়। তখন ভূত-প্রেত-পিশাচগণ অট্ট-হাস্যে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে; সংসারের শ্মশানের সংহারিণী মূর্ত্তি প্রকটরূপে প্রকাশ পায়; শান্তির সুশুভ্র কান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির আবিল আলেখ্য দৃষ্ট হয়।

* * *

অহমিকা।

মানুষ মনুষ্যত্বহীন! মানুষ পশুরও অধম। তাই সে, অহমিকায় আচ্ছন্ন হইয়া আত্মবিস্মৃত; অবিদ্যার অনৃত অনুষ্ঠানে অবিতথ জ্ঞানে সে আপ্যায়িত; আত্ম-শ্লাঘার আস্ফালনে সদাই আনন্দিত; স্ফীতবক্ষে ধরাখানিকে সরা-জ্ঞান করিয়া, অবিরাম সে কোথায় চলিয়াছে। পদে পদে পদস্খলন হইতেছে! দৃষ্টি নাই বা দেখিয়াও দেখে না! পরিণামে ভগ্নপদে ভগ্নহস্তে গৃহে প্রত্যাগত। আশে পাশে সর্ব্বত্রই এই দৃশ্য।

* * *

মানুষ জন্মান্ধ।

পরিণতির এই অবিচ্ছিন্ন প্রতিকৃতি, প্রতিনিয়ত নয়ন-কোণে প্রতিভাত হইতেছে। মানুষ অন্ধ, প্রপঞ্চের প্ররোচনায় প্রতিপদে পর্য্যুদস্ত। প্রমত্ত মানব ভ্রান্ত উপাসনায় রত। কত কুরুক্ষেত্রের করাল দৃশ্য অবিরত নেত্রগোচর হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অভিজ্ঞানে সংজ্ঞা হয়, পরিশীলনে প্রত্যভিজ্ঞা আনিয়া দেয়; কিন্তু মানুষ—যে তিমিরে সেই তিমিরে। সম্মুখে প্রশস্ত পথ বিদ্যমান। একবার উহা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে, গন্তব্য স্থানে পৌছান যায়। সংস্কার-বশে, অন্ধও স্বীয় পন্থা খুঁজিয়া লইতে পারে। কিন্তু

মানুষ, স্বেচ্ছায় সংস্কার-বিহীন; মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মান্ধ! মানুষ কেমন করিয়া পথ পাইবে?

* * *

শান্তি।

বস্তুতঃ সাধারণতঃ তিনটি অবস্থা; কঠিন, তরল ও বাষ্পীয়। আবার অতি কঠিন হইলেই ভঙ্গ-প্রবণ হয়। তাই কাচকে আঘাত করিলেই, উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। বস্তুর এই অবস্থান্তর তাপ-সংযোগে ঘটিয়া থাকে। কঠিন লৌহপিণ্ডে তাপ-সংক্রমিত হইলে, প্রথমতঃ কোমল হইয়া পরে তরলতা প্রাপ্ত হয়; আরও পরে বাষ্পীয় আকার ধারণ করে। বস্তুর কোমল বা তরল অবস্থায় রূপান্তর ঘটে; তখন উহাকে ছাঁচে ঢালিয়া স্বেচ্ছামত গঠনে গঠিত করিয়া লওয়া যায়। মানুষের মনের অবস্থাও তদ্রূপ। উহার স্বাভাবিক অবস্থা সাধারণতঃ কঠিন। উহার রূপান্তর করিতে হইলে, প্রথমে জ্ঞান-অগ্নি-সংযোগে কোমল বা তরল করিতে হইবে। পরে উহাকে ভক্তি-ছাঁচে ঢালিয়া মনোমত গঠনে গড়িয়া লইতে হইবে। তখন উহাকে যে আকারে ইচ্ছা, সেই আকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। বিশেষতঃ মনকে দ্রব না করিলে উহার মালিন্য দূর হয় না। সেই সর্ব্বশান্তি-ময়ের কৃপাভিলাষী হইলে, মনকে নূতনরূপে গড়িয়া পিটিয়া লইতে হইবে। তখন শান্তির অনাবিল কান্তি হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে।

—— * ——

এখনও আসিলে না?

শান্তি-অন্বেষণ।

সংসার, শান্তিহারা হইয়া, আবার তোমার শরণাগত। শান্তিময়!—শান্তি দেও! জানি না, —তুমি এখন কত দূরে—স্মৃতির বহির্ভূত অতীতের কোন্ পথে

—পিছাইয়া পড়িয়াছ! জানি না—তুমি এখন কত দূরে—ভবিষ্যতের কোন্ দূর পথে—অপেক্ষা করিতেছ! সংসার, এখন তোমার একান্ত অভাব অনুভব করিতেছে। সংসার, এখন তোমার অন্বেষণে পাতিপাতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

* * *

পথ—অজানা।

পথ অজানা, তাই কি অগ্রসর হইতে পারিতেছে না? পথ বিস্মৃত হইয়াছে, তাই কোনও অন্বেষণ পাইতেছে না? না—না!—তোমাকে পাইয়াও বুঝি রাখিতে পারিতেছে না! তোমাকে দেখিয়াও বুঝি চিনিতে পারিতেছে না! তাই বুঝি এই বিড়ম্বনা! কিন্তু, তুমি তো জোনাকীর অতি-ক্ষুদ্র আলোক-বিন্দু নও! তুমি তো চপলার চকিত-চমক নও! তুমি যে চিরজ্যোতিষ্মান্ দিব্য-আলোক-ময়! তোমায় কি কেহ না দেখিয়া থাকিতে পারে? তবে বুঝি দূরে—অতি-দূরে সরিয়া পড়িয়াছ! তাই কেহ তোমার অনুসরণ করিতে পারিতেছে না!

* * *

যন্ত্রণা—অসহ।

জ্বলনের বড় জ্বালা। শান্তিহারা সংসার, অশান্তি-অনলে পড়িয়া, অহরহঃ অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে! যেদিকে চাই, যাহার প্রতি দৃষ্টি করি, কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। সকলেই যেন অশান্তির অশেষ উদ্বেগে অবসন্ন। কোথাও দারিদ্র্যের দারুণ পীড়ন, কোথাও শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দন, কোথাও ব্যথিত ভয়-ভীতের চঞ্চল-নয়ন! যেন শান্তি আর কোথাও নাই! যেন সংসার হইতে চির-তরে সে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! সংসারী চারি ভিতে 'শান্তি শান্তি' করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে! কোথাও শান্তি পাইতেছে না।

সংসারী শতকণ্ঠে ডাকিতেছে—শান্তিময়!—কোথা তুমি—শান্তি দেও! কিন্তু কোথাও তোমায় মিলিতেছে না।

* * *

আসিলে না কেন? সময় কি এখনও হয় নাই? অশান্তির চরম-অবস্থা এখনও কি সমাগত হয় নাই? ধর্ম্ম—সে তো বহু দিন বিলুপ্তপ্রায়! গ্লানি—প্রতি পদে! অধর্ম্মের অভ্যুত্থান—কোথায় নয়? এখনও কি তোমার আসিবার সময় হয় নাই? দুষ্কৃতির একশেষ হইয়াছে। সাধুগণ 'পরিত্রাহি' ডাকিতেছেন। সামগান-মুখরিত শান্তিকানন দাবানল-দগ্ধ ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। শান্তিময়!—এখনও কি তোমার আসিবার সময় হয় নাই? তুমিই না বলিয়াছ,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

যখনই সাধুদিগের পরিত্রাণের আবশ্যক হইবে, যখনই দুষ্কৃতের দমনের প্রয়োজন হইবে, যখনই জীবের কলুষিত হৃদয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত না করিলে পৃথিবী হইতে ধর্ম্মলোপের—শান্তিলোপের সম্ভাবনা হইবে, তখনই তুমি আবির্ভূত হইবে। তবে কেন—তুমি এখনও আসিলে না কেন? দুর্দ্দশার তো কিছুই বাকী নাই! দুরবস্থা তো পূর্ণাঙ্গে প্রকটিত! কৈ তুমি?—কোথা তুমি?—আসিলে কৈ?

গীতা-মন্ত্র।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥"

কুরুক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্র মহাসমরে কুরুপাণ্ডবের মহতী সেনার সমাবেশ হইয়াছে। কৌরব পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য এবং পাণ্ডব-পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ। উভয় পক্ষের সৈন্য-সংখ্যা সঙ্কলন করিলে দেখিতে পাই,—তিন লক্ষ তিরানব্বই হাজার ছয় শত ষাট খানি রথ, ছয় লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয় শত ষাটটী হস্তী, এগার লক্ষ আশী হাজার নয় শত আশীটী অশ্ব, এবং উনিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার তিন শত পদাতিক সৈন্য কুরুক্ষেত্র-সমর-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ভূমণ্ডলে এরূপ বিপুল সমরায়োজন আর কখনও হয় নাই। এই ভীষণ সমরায়োজনের ফলাফল কি হইবে, তাহা জানিবার জন্য তৎকালে সকলেই যে অত্যধিক ঔৎসুক্যান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই ঔৎসুক্য-বশেই ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যুদ্ধাবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য অনুরোধ করেন; আর সেই প্রশ্নোত্তরের ফলেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ মহারত্নের উদ্ভব হয়।

* * *

দুইটী শ্লোক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ সেই অপূর্ব্ব অনুপম রত্ন শুভক্ষণে সংসারে প্রকটিত হইয়াছে। সে রত্নের প্রভায় অধুনা বহু জ্ঞানি-গুণিজনের হৃদয়-ক্ষেত্র উদ্ভাসিত হইতেছে; আবার, সে রত্নের ঔজ্জ্বল্যে অনেক অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রাণে জ্ঞানের আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইতে চলিয়াছে। তবে অজ্ঞানী অনভিজ্ঞ জনের হস্তে পড়িয়া সে রত্নের কোথাও

যে অবমাননা না হইতেছে, তাহাও নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অপব্যাখ্যা কুব্যাখ্যাও অনেক সময় ঘটিয়া থাকে ; তাহার ফলে, সময়ে সময়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলার ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দেখিতে পাই। কিন্তু সামান্য একটু সরল দৃষ্টিতে দেখিলে, গীতার অপব্যাখ্যার কোনই আশঙ্কা থাকে না। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন এবং সেই প্রশ্নে সঞ্জয়ের উত্তর—দুইটী শ্লোকে গীতার নিগূঢ় তত্ত্ব কেমন উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত রহিয়াছে! এক বার গীতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সে তত্ত্ব আপনিই হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়। সে ক্ষেত্রে, সমগ্র গীতাশাস্ত্র অধ্যয়নেরও বড় একটা আবশ্যক করে না। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের একটী শ্লোক এবং সঞ্জয়ের উত্তরের একটী শ্লোক—এই দুইটী শ্লোক পাঠ করিলে, আর তাহার মর্ম্মানুধাবন করিতে পারিলে গীতা-পাঠ শেষ হইয়া যায়, গীতাপাঠের ফল লাভ হয়।

* * *

সার তথ্য।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়ঃ॥" তাঁহার পুত্রগণ এবং পাণ্ডবগণ যথাক্রমে একাদশ অক্ষৌহিণী এবং সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন। সঞ্জয়ের নিকট ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের অবস্থার বিষয় জানিতে চাহিতেছেন। কোন্ পক্ষ পরাজিত এবং কোন্ পক্ষ জয়শ্রীযুক্ত হইবেন, তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। তাঁহার প্রশ্নের ইহাই উদ্দেশ্য। আর একটু অনুসন্ধান করিলেই আমরা দেখিতে পাই, সর্ব্বদর্শী সঞ্জয় এক কথায় কেমন সে প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। তিনি বলিতে-

ছেন,—"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥" যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে পক্ষ ভগবানের অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইয়াছেন, এবং যে পক্ষে কর্ম্মযোগী অর্জ্জুন আছেন, অর্থাৎ যে পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান চলিয়াছে, রাজলক্ষ্মী বিজয়-শ্রী নিশ্চয়ই সেই পক্ষ অবলম্বন করিবে, ইহাতে কোনই সংশয় নাই। গীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, আর শেষ শ্লোকে সঞ্জয়ের এই উত্তর,—ইহাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সারসর্ব্বস্ব। যিনি প্রকৃত সাধক, তাঁহার বোধ হয়, সমগ্র গীতা-পাঠের আর আবশ্যক নাই। ঐ প্রশ্ন আর উত্তর দেখিয়াই তিনি মর্ম্মার্থ অবগত হইতে পারিবেন।

* * *

আশা-আকাঙ্ক্ষা। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের আর সঞ্জয়ের ঐ উত্তরের এক একটী শব্দের বিষয় আলোচনা করিলে কত অভিনব তত্ত্বই অবগত হওয়া যায়! প্রশ্নের মধ্যে কত আশা-আশঙ্কা যুগপৎ সূচিত হইয়াছে! প্রশ্নের প্রথম শব্দ—'ধর্ম্মক্ষেত্রে'। এই 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' শব্দ ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে, ধৃতরাষ্ট্র জয়-পরাজয় বুঝিয়া লইয়াছেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, মানুষের প্রাণে স্বতঃই ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হয়। ধৃতরাষ্ট্র তাই আশা করিতেছেন,—তাঁহার দুর্য্যোধনাদি পুত্রগণের প্রাণে বুঝি বা ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইয়া থাকিবে! আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহারা রক্ষা পাইবে;—পাণ্ডবগণের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চনা করিয়া বৃথা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের আশা। আবার আশঙ্কাও গুরুতর! ধর্ম্মক্ষেত্রে

উপস্থিত হইয়াও তাঁহার পুত্রগণের যদি মতি-পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদল-সহ উপস্থিত যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধই করিয়া থাকে। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কিমকুর্ব্বত'। যুদ্ধার্থ-সমবেত মৎপুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ কি করিতেছে? এরূপভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার কারণ—তাঁহার মনোমধ্যে আশা-আশঙ্কার যুগপৎ দ্বন্দ্ব। তিনি মনে করিতেছেন,—'বুঝি বা স্থান-মাহাত্ম্যে তাঁহার পুত্রগণের মতি পরিবর্ত্তিত হইল।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে আশঙ্কা হইতেছে,—'না—না, তাহারা দুর্ব্বিনীত। তাহাদের মনে কখনই সদ্ভাবের উদয় হইবে না। যদি সদ্ভাবের ধর্ম্মভাবের উদয় না হয়, তাহাদের নিধন অবশ্যম্ভাবী।' সুতরাং বলিতে হয়,—যুদ্ধের ফলাফল তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তথাপি যে তাঁহার মনে হইতেছে,—'যদি স্থান-মাহাত্ম্যে তাঁহার অধর্ম্মী পুত্রদের মতি একটু পরিবর্ত্তিত হয়'; তাহার কারণ,—পিতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়, সন্তানের অমঙ্গল-দর্শনে অতিমাত্র কাতর। তাই, সে ভাব গোপন করিয়া, পুত্রেরা কি করিতেছে,—তিনি এই মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার বড় আশা—সঞ্জয় উত্তর দেন, তাঁহার পুত্রগণের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—ধর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহাদের মনে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হইয়াছে। এখানে আরও এক ভাব মনে আসিতে পারে। তাঁহার দুর্ব্বিনীত পুত্রগণের মতিগতি যদিও পরিবর্ত্তিত না হয়, স্থান-মাহাত্ম্য-প্রভাবে পাণ্ডবগণের মনেও ঔদাসীন্য আসিতে পারে। পাণ্ডব-পক্ষীয় অর্জ্জুনাদি ধর্ম্মভীরু যোদ্ধৃগণ, বিপক্ষপক্ষে আত্মীয়স্বজনকে এবং আপনাদের আচার্য্য গুরুজন-

বর্গকে যুদ্ধার্থ সমবেত দেখিয়া তাঁহাদের অঙ্গে অস্ত্রনিক্ষেপ অধর্ম্ম মনে করিয়া, যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারেন। তাহা হইলেও তাঁহার পুত্রগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তাই ধৃতরাষ্ট্রের বড় আশা—এক পক্ষ না এক পক্ষ এ যুদ্ধে বিরত হইবে;—তাঁহার পুত্রগণের প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক না হইলেও পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন। তাহা হইলেও, তাঁহার পুত্রগণের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। ফলতঃ, যেরূপেই হউক, যুদ্ধ স্থগিত হইবে,—তাঁহার পুত্রগণ নিরাপদে রাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ করিবে,—গীতার প্রারম্ভে ধৃতরাষ্ট্রোক্তিতে 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' শব্দে ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে। শ্লোকোক্ত 'মামকা' এবং 'পাণ্ডবাশ্চ' শব্দদ্বয়ে দুর্য্যোধনাদি আত্মজগণের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহের ভাব এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণের প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের নিগূঢ় উদ্দেশ্য শ্লোকোক্ত কয়েকটী শব্দের বিশ্লেষণেই বেশ উপলব্ধি হয় না কি?

* * *

ভবিষ্য-ফল।

ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নে 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' শব্দ যেরূপ বহুভাবদ্যোতক, 'কুরুক্ষেত্রে' শব্দও সেইরূপ নিগূঢ় অর্থ-নির্ণায়ক। টীকাকারগণ বলেন,—ঐ 'কুরুক্ষেত্রে' শব্দ প্রয়োগেও যুদ্ধের ফলাফল অবধারিত আছে। মহামতি কুরু ঐ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত হয়। 'ক্ষেত্র' এবং 'কর্ষণ' শব্দদ্বয়ের লৌকিক অর্থ অনুসারে কৃষিকার্য্য কল্পনা করা হইয়া থাকে। কৃষিকার্য্যে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতির ফলে শস্যোৎপত্তি ঘটে। শস্যোৎপাদন কালে, কৃষক শস্যক্ষেত্র হইতে তৃণাদি উন্মূলিত করিয়া

থাকে। সেই তৃণোন্মূলনের নানাবিধ যন্ত্রাদি আছে। দুর্য্যোধনদির আবির্ভাবে কুরুক্ষেত্র-রূপ ভারতবর্ষের প্রধান কর্ষণভূমি আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সেই আগাছার মূলোৎপাটন জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপী কৃষক অর্জ্জুনাদি-রূপ অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন। আর তাহাতে দুর্য্যোধনাদি-রূপ অধর্ম্মের আগাছা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হইতে সমূলে উৎপাটিত হয়। অধার্ম্মিকগণের প্রাবল্যে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সেই গ্লানি দূর করেন। দুর্য্যোধনদি অধর্ম্মাবতারগণের উচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন হইবে, 'কুরুক্ষেত্রে' শব্দে তাহারই আভাষ পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে, বলা যাইতে পারে, কুরুক্ষেত্র মহাসমরের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন।

* * *

সংশয়চ্ছেদ।

সঞ্জয়ের উত্তরে সকল সংশয় দূরীভূত হয়। তিনি যখন বলিলেন,—'যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন, যে পক্ষে পার্থ ধনুর্দ্ধারণ করিয়াছেন, বিজয়শ্রী সেই পক্ষই অবলম্বন করিবেন'; তখনই জয়-পরাজয়ের বিষয় উপলব্ধি হইল বটে! কিন্তু ইহারও মধ্যে আর এক পরম নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যে পক্ষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আছেন,—ইহার অর্থ কি? অর্থ,—যে পক্ষ অনন্যা ভক্তি দ্বারা ভগবানের করুণা-কণা লাভে সমর্থ, সেই পক্ষই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত। এইখানেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রসঙ্গ উঠিতে পারে। ভগবান পক্ষাবলম্বন করেন,—কাহার? ভগবানের করুণা-লাভ করিতে পারা যায়—কি উপায়ে? কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মানুষ ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। জ্ঞানের দ্বারা তিনি অধিগত হন। কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির—এই তো সমবায়! আর এই সমবায়ই স্বয়ং তিনি! কোন্ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার করুণা লাভ হয়, কিরূপ ভক্তিতে তিনি অধিগত হন, আর কিরূপ জ্ঞানের তিনি গম্য, গীতাশাস্ত্রের অভ্যন্তরে সেই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে গীতার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। সেই শ্লোকটীর বিষয় অনুধাবন করিলে, ভগবদনুকম্পা লাভের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎ পরমো মদ্ভক্ত সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

যাঁহার কর্ম্ম ভগবানের প্রীতিসাধন, যাঁহার প্রাপ্তব্য একমাত্র ভগবান, যাঁহার ভজনাই ভগবৎ-কর্ম্মানুষ্ঠান, যিনি আশক্তিশূন্য, উপকারী-অপকারী সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন, তিনিই ভগবানের অনুকম্পা লাভ করেন। কেমন কর্ম্ম করিলে, কেমন ভাবের ভাবুক হইলে, কেমন ভক্তি থাকিলে, কেমন ভাবে হৃদয়ে সমদর্শিতা জন্মিলে, কি কর্ম্মের কি ভক্তির কি জ্ঞানের ফলে, শ্রীভগবানকে লাভ করা যায়, এই শ্লোকেই তাহা সম্পূর্ণরূপ উপলব্ধি হয়। গীতা পাঠ করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে গীতার প্রথম শ্লোকে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের বিষয় এবং শেষ শ্লোকে সঞ্জয়ের উত্তরের বিষয় অনুধাবন করা কর্ত্তব্য। তার পর, গীতার মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, কেমন ভাবে কি কার্য্যের দ্বারা সাধনার সার নিধিকে হৃদগত করিতে পারা যায়, তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়।

—— * ——

একাগ্রতা।

কেন আসিস!

সারাদিন সংসারের চিন্তায় কাটাইলাম। দিনান্তের পর, মুহূর্ত্ত মাত্র, একবার ইষ্টদেবের নাম জপ করিব! দুশ্চিন্তা!—আর কি তোর সময় ছিল না?—তুই আবার আসিয়া আমার জপমালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলি?

* * *

কি ভীষণ!

জন-সমাগম-শূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল মহারণ্য। ঐ শুন, সিংহ গর্জ্জিতেছে; ঐ দেখ, কুরঙ্গ দৌড়িতেছে। ও কি অজগর!—ও যে পাহাড়-পর্ব্বতের মত পড়িয়া-রহিয়াছে! ও কি আবার!—অত বড় প্রকাণ্ড বন্য মহিষ, অবাধে গলাধঃকরণ করিল! বায়ুভরে বৃক্ষশাখা নড়িল; মর্ম্মর শব্দ হইল; পশুপক্ষী প্রাণভয়ে পলাইয়া বনান্তরে আশ্রয় লইতে ছুটিল! অরণ্য কি ভীষণ!

* * *

কি প্রশান্ত!

আবার অরণ্য—প্রকৃতির কি রম্য নিকেতন! বৃক্ষের পর বৃক্ষ—ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃহত্তম—অনন্ত-শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে। উপরে সূর্য্যরশ্মি চিকিমিকি খেলিতেছে। পদপ্রান্তে শ্রান্তপ্রাণী শান্তছায়া উপভোগ করিতেছে। ও দিকে আবার, কত লতাকুঞ্জ গুল্মপুঞ্জ—শ্বেত-পীত-নীল-লোহিত নানা-রঙ্গে অনুরঞ্জিত রহিয়াছে—প্রকৃতি স্তরে স্তরে পুষ্পস্তবক সাজাইয়া দিয়াছে। মধ্যস্থলে কিবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্যামল-ভূমি,—পদপ্রান্ত বাহিয়া স্রোতোস্বিনী কুলুকুলু গাহিতেছে! মরি মরি!—কি মধুর প্রশান্ত ভাব!

* * *

নির্ণয় নাই!

এই বনে, প্রবাহিনীর পবিত্র তীরে, মহর্ষির পুণ্যময় আশ্রম ছিল। কৈ, আজি তো তাহার চিহ্ন-মাত্রও খুঁজিয়া পাইতেছি না! কোথা সে ভগ্নকুটীরখানি—যেখানে বসিয়া ঋষি ইষ্টনাম জপ করিতেন! কোথা তাঁহার পদ্মাসন—যে আসনে অনুধ্যান আনিয়া দিত! কেহ বলিতে পার কি? বাতুল!—যুগ-যুগান্ত বহিয়া গেল, অণু পরমাণুতে মিশিয়া গেল! এখন সে সংবাদ কোথায় পাইবে—কে দিবে? ঐ দেখ,—নদী-প্রবাহ নিত্য-নূতন সৈকত-ভূমি ভাঙ্গিতেছে গড়িতেছে। ঐ দেখ,—বিশাল বটবৃক্ষ জটা বিস্তার করিয়া ক্রোশদ্বয় বেড়িয়া লইয়াছে। ঐ দেখ,—প্রকাণ্ড বল্মীক-স্তূপ, পাহাড়ের ন্যায় বিশালতা বিস্তার করিয়াছে। এখানে কোথায় ঋষির আশ্রম ছিল, কে নির্ণয় করিবে!

* * *

কি দেখিলাম!

অন্ধনয়ন!—একবার ঐ বল্মীক-স্তূপ প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখ দেখি! ও কি!—বল্মীক-স্তূপ-মধ্যে স্ফটিক-মণি কোথা হইতে প্রস্ফুট হইল? দেখি দেখি!—হস্ত-স্পর্শ করিয়া দেখি—এ মণি কিরূপে আসিল? এ কি!—বল্মীক-স্তূপ-মধ্যে কেন অনুশোচনার স্বর-উঠিল! এ কি তবে মৃত্তিকা-গ্রথিত জড়বস্তু নহে? এ কি তবে প্রাণভূত প্রোথিত মনুষ্য-দেহ? তাই তো—তাই তো—কি দেখিলাম! সেই ঋষি, যুগ-যুগান্তের পর, বল্মীক হইয়া জমিয়া আছেন। তবু তাঁর ধ্যান-ভঙ্গ হয় নাই। তবু তাঁর একাগ্রতা নষ্ট হয় নাই! অরণ্যের দারুণ ভীষণতা, সিংহ-ব্যাঘ্রের বিকট হুঙ্কার—কিছুতেই তো একাগ্রতা ভাঙ্গিল না। যোগি!—আমার পাপ-কর-স্পর্শে তোমার ধ্যানভঙ্গ

হইল? তোমার চরণে ধরি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আর দেবতা, দয়াময় তোমরা, তোমাদের ঐ একাগ্রতার কণামাত্র আমায় দান কর। সংসার-কীট আমি, তোমার কৃপায় যেন তরিয়া যাই।

—— * ——

জগজ্জননী।

জগদ্ধাত্রী। আজি জগদ্ধাত্রী-পূজা। বঙ্গগৃহে ভবভয়হারিণী ভবসুন্দরী মহাদেবীর আবির্ভাব। নানালঙ্কার-ভূষিতা মা আমার, এবার—চতুর্ভুজা, সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া, শঙ্খচক্র-ধনুর্ব্বাণ-লোচন-ত্রিতয়ন্বিতা

* * *

অপরূপ! কি অপরূপ রূপ! 'বালার্কসদৃশীং তনুং'! তরুণ অরুণের ন্যায় রূপচ্ছটা—দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছে! নয়ন!—উন্মীলিত হইয়া দেখ! হৃদয়!—তন্ময় হও। 'ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্।'

* * *

শক্তিবিজয়। সংসারে দেবশক্তি ও পশুশক্তির চির-সংগ্রাম। পশুশক্তি—সিংহশক্তি। সেই সিংহশক্তি—বিমর্দ্দিত বশীকৃত। মা-আমার দেখাইতেছেন,—দেবশক্তির অধিকারী হইলে, পশুশক্তি পদানত হইবেই হইবে।

* * *

ভাব-ব্যক্তি। দেবশক্তির অধিকারে—অধিগত-ত্রিকাল-দর্শন; নয়ন-ত্রিতয়ে তদ্ভাব-বিকাশ। ত্রি-নয়ন—বর্ত্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ ত্রিকালদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। চতুর্হস্ত—উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক্-চতুষ্টয়ে অধিকার-

বিস্তার। ধনুর্ব্বাণ-ধারণ—অরাতিনিধন সূচিত করিতেছে। চক্র-ধারিত্বে—সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। মা-আমার, শুভশঙ্খে মঙ্গল-ঘোষণা করিতেছেন।

* * *

শক্তিমন্ত্র।

মাতৃমূর্ত্তি, মনুষ্যকে দেবশক্তিতে অনুপ্রাণিত করিতেছে। 'মানুষ!—মাতৃশক্তির দেবশক্তির অধিকারী হইবার চেষ্টা কর!'—নবনব মূর্ত্তি পরিগ্রহে, তিনি পুনঃপুনঃ সেই উপদেশ আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন। কিন্তু সে অধিকার—কিসে হয়?—কি প্রকারে জন্মে? সেবায়—উপাসনায়! মাতৃশক্তির উপাসনা কর, মাতৃশক্তির সেবা কর, মাতৃশক্তির অনুধ্যান কর; দেবশক্তি আপনিই অধিগত হইবে। সাংসারিক প্রতি শিক্ষায় সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত নহে কি? শিশু, বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করে; কত উপাসনা, কত অনুধ্যান—তবে বিদ্যাবান্ হয়! ধার্ম্মিক বল, ধনবান্ বল,—কোন্ বিষয়ে কম-সাধনায় কে কৃতকার্য্য? মন!—কেন তুমি হতাশ হও?

—— * ——

দিব্য-দৃষ্টি।

পিপাসু নয়ন।

পিপাসু নয়ন, সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটে। প্রকৃতির রম্য উপবন, বনশোভা কুসুম-সম্ভার, পতত্রির বিচিত্র পক্ষপুট, নীলাকাশে নক্ষত্রের মালা,—নয়ন কোন্ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট নয়? ময়ূরের মোহন-নর্ত্তন—মেঘ-কোলে ইন্দ্রধনু-বিকাশ,—পিপাসা আরও বাড়াইয়া দেয়। পূর্ণিমার পূর্ণ-শশধর,—দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটে না! পিপাসু নয়ন, নির্নিমেষে সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে চায়।

উৎপাটন কর।

সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, নয়ন সৌন্দর্য্যেই আত্মহারা হইল! সৌন্দর্য্যের স্রষ্টার চরণে একবার প্রণতি করিতে শিখিল না? যে নয়ন তাহা না শিখিল, যে নয়ন স্রষ্টার প্রতি প্রীতিভরে অবনত হইতে না পারিল, সে নয়ন নাই বা রহিল! সে নয়ন উৎপাটন করিয়া ফেলিতে পারিবে না কি? ভক্ত বিল্বমঙ্গল যেদিন দেখিলেন,—তাঁহার নয়ন পূর্ব্ব-সংস্কার ভুলিতে পারে নাই—তাঁহার নয়ন বণিক-পত্নীর প্রতি লোভ-লোলুপ নিরীক্ষণ করিতেছে,—অমনি তিনি লৌহ-শলাকা বিদ্ধ করিয়া সে নয়ন উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন! ভক্ত!—তুমি পারিবে না কি?—যে নয়ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া সৌন্দর্য্যের স্রষ্টার চরণে ভক্তি-প্লুত-প্রাণে প্রণত হইতে না পারিল, সে নয়ন তুমি উৎপাটন করিতে পারিবে না কি? দিব্য-দৃষ্টি কবে পাইবে?

—— * ——

শিক্ষা।

সার্ব্বজীবন।

সার্ব্বজনীন প্রীতির ভাব, জগতে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভূতি-সাপেক্ষ। 'জগৎ ব্রহ্মময়'—এই জ্ঞান, সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে প্রতিপন্ন হয়। হিন্দুর প্রাণে সেই ভাব—কি সুন্দর পরিস্ফুট ছিল!

* * *

প্রীতির ভাব।

যখন দেখিতে পাই, কেহ প্রণতি-পূর্ব্বক বিশাল বটবৃক্ষ-মূলে জলসেচন করিতেছেন; যখন দেখিতে পাই, কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া হিমাচলের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গকে নমস্কার করিতেছেন; যখন দেখিতে পাই, কেহ অনলে, কেহ

অনিলে, কেহ পত্রপুষ্পফলে, কেহ পশুপক্ষিকীটপতঙ্গে, প্রীতির ভরে পূজা করিতেছেন; তখন কোন্ ভাবের বিকাশ দেখি?

* * *

স্তরপর্য্যায়ে।

জাগতিক প্রীতির ভাব, স্তরপর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়া কোনও মনীষি লিখিয়া গিয়াছেন,—"(১) নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধুবান্ধব-স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে (৬) স্বজাতিবাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত।"

* * *

হিন্দুর অধিকার।

"আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোমটির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানব মাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে সেই অবাঙ্মনসোগোচরে আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।" ব্রহ্মসত্তা লইয়া জগতের সত্তা। এই সার শাস্ত্র-তত্ত্বে হিন্দু কতটুকু অধিকার লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, স্তরপর্য্যায়ে তাহাই পরিদৃষ্ট।

* * *

বর্ত্তমানে?

বর্ত্তমানে? বর্ত্তমানে এ জাতির কি অবস্থা? সর্ব্ব-প্রকৃতিতে সম-অনুরাগ, সে তো বহুদিন হইল, বিস্মৃতির অগাধ গর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে! স্বজাতি-বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ, আবিলতার কত শত নিম্নস্তরে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, তাহা তো নির্ণয় করিতেই পারি না! প্রদেশ-বাসীর প্রতি বা স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, আবর্ত্তের ঘোরে কোন্ সমুদ্রের মধ্যে ভাসিয়া গিয়াছে, কে খুঁজিয়া বাহির করিবে? বন্ধুবান্ধবস্বজনের প্রতি অনুরাগ, হায় হায়, অবহেলায় অতল সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়াছি! তেমন ডুবুরি কোথায় পাইব—কে আর তাহা খুঁজিয়া দিবে? "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—যে জাতির মূল নীতি, নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ সে দেশে কেমনে তিষ্ঠিতে পারিবে? সে ভাব বহুদিন হইল, বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে! এখন আবার কোন্ পথে তাহাকে খুঁজিতে যাইব?

* * *

আবার 'ক-খ'।

নিজের প্রতি অনুরাগ! তাই বা কোথায় এখন? তাও যদি থাকিত, নিজে নিজেই যদি মানুষ হইবার চেষ্টা পাইতাম, তাহা হইলেও তো সাফল্যের আশা ছিল! ফলতঃ, এখন এমনই অধঃপতনের আবর্ত্তে আমরা পড়িয়াছি যে, আবার 'হাতে খড়ি' দিয়া প্রথম হইতে 'ক-খ' শিক্ষা আরম্ভের আবশ্যক হইয়াছে। এখন, প্রথমে শিখিতে হইবে—নিজের প্রতি অনুরাগ, নিজ পরিজনের প্রতি অনুরাগ; তার পর, ক্রমে ক্রমে, বন্ধুবান্ধব-স্বজনের প্রতি, স্বগ্রামবাসীর প্রতি, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ। আবার এমন করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারিলে, সকল শিক্ষার সার শিক্ষা সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতিতে অনুরাগ সঞ্চিত হইবে।

শরণে।

আকুল প্রাণ।

আকুল প্রাণ, আশ্রয় চায়। সংসার-সাগরে দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে জীবন-তরণী বিক্ষুব্ধ। তখন আর মানুষ স্থির থাকিতে পারে না। প্রাণ 'পরিত্রাহি' ডাকিয়া প্রার্থনা জানায়—আশ্রয় চায়।

* * *

আশ্রয় চায়।

বিস্মৃত জীব, বিপন্ন হইয়া, অন্বেষণ করে। যে ভাষা ফুটে, যে ভাব উঠে, যে ভক্তি ছুটে, সেই মন্ত্রে, সেই যন্ত্রে, সেই কুসুম-সম্পুটে, সে তখন তাঁহার অর্চ্চনা আরম্ভ করে। তখন আর তার বিস্মৃতির ভাব থাকিতে পায় না।

* * *

আশার আশ্বাস।

এ যদি না হইত, এ জীবন এক দণ্ড স্থায়ী হইত কি না—সন্দেহ করি। মানুষ বাঁচিতেই পারিত না। প্রবলের প্রচণ্ড কষাঘাতে দুর্ব্বলের দেহ-যষ্টি যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে, "ভগবান্ তুমি বিচার ক'রো"—এ নির্ভরতা যদি মানুষের মনে উদয় না হইত, তবে কি আর এ সংসারে তিষ্ঠান যাইত? দৈন্য-দারিদ্র্যের দারুণ সংগ্রামে, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের আশীবিষ-দংশনে, মানুষ কি কখনও বাঁচিতে পারিত—যদি "কোথা দীননাথ!"—আশ্বাসের দীর্ঘশ্বাসে আশার সূচনা না করিত?

* * *

অসময়ের সময়।

তবেই বুঝিতে হয়, অসময়ের সময় এক জন আছেন, বিপন্নের বন্ধু আশ্রয়দাতা এক জন আছেনই আছেন। মানুষের শক্তি যেখানে পরাভূত, পুরুষকার-আত্মনির্ভর-দণ্ড যে অকূলে কূল না পাইল, সেখানেই সেই বিরাট্

শক্তির অপূর্ব্ব প্রভাব বিরাজমান্। বিভ্রান্ত জীব—সহজে কি কভু চেতনাপ্রাপ্ত হয়? পরীক্ষার আবর্ত্ত-ঘোরে না পড়িলে, বিনিদ্র জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গে কি? পরীক্ষা-পারাবারে পড়িয়াছ; মন!—ভয় পাইও না! অদূরে ঐ দেখ, তাঁহার বিশাল হস্ত তোমার উদ্ধার-সাধন জন্য প্রসারিত হইয়াছে। ভয় কি?—একবার শরণাপন্ন হও দেখি!

—— * ——

মনঃস্থৈর্য্য।

দ্বন্দ্ব।

সয়তানে ও দেবতায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। মনো-মন্দিরের বিগ্রহ, ঐ বুঝি সয়তানে লুটিয়া লয়! "মন!—এখনও সাবধান!—দ্বার দৃঢ় করিয়া দণ্ডায়মান হও।"

* * *

আহ্বান।

জলদ-গম্ভীর-স্বরে কে যেন নিয়ত আহ্বান করিতেছে,—"মন!—একটু স্থির হও, একবার শোন! আর অবহেলা করিও না; তোমার সোণার-মন্দির ছারে-খারে যাইতে বসিয়াছে!"

* * *

শুনিবে কে?

কিন্তু শুনিবে কে? মন যে কোথায় উধাও হইয়া ছুটিয়াছে। বক্তার বক্তৃতা, বায়ুর সাগরে বিলীন হইল। দেবতার আহ্বান, বিফলে যাইল। মনঃশ্রোতা কোনদিকে কর্ণপাত করিল না।

* * *

সংসারে সমস্যা।

সংসার এই সঙ্কট-সমস্যায় নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ নিয়ত সাবধান করিয়া দিতেছেন। বিবেক-রূপী বক্তা, প্রাণে নিয়ত উপদেশামৃত

ঢালিতেছেন। কিন্তু শ্রোতা—সচঞ্চল; শুনিবে কে? বক্তার বক্তৃতা—শ্রোতার নিকট। শ্রোতাই যদি না শুনিল, তবে কথার কার্য্যকারিতা কোথায়?

* * *

মনঃস্থৈর্য্য।

সংসারের এই সমস্যা দূর করিতে হইবে। দেবমন্দিরের দুয়ার হইতে যদি সয়তানকে দূরীকৃত করিতে চাও, তবে বদ্ধপরিকর হও,—মন যেন আর চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া না বেড়ায়! মন দৃঢ় করিতে পারিলে, মন্দিরের দ্বার আপনিই দৃঢ় হইবে;—সয়তান শত চেষ্টায়ও পুর-প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাই প্রয়োজন—মনঃস্থৈর্য্য।

—— * ——

সোঽহং।

ঈশ্বর কৈ?

অনলে, অনিলে, সলিলে,—পাদপে, প্রান্তরে, প্রস্তরে,—অনন্তে, আকাশে, অবনীমণ্ডলে,—কেন দিশাহারা হইয়া ছুটিয়াছি? জলস্থলমরুদ্ব্যোম সসাগরা ধরা—কেন তন্ন তন্ন করিয়া আলোড়ন করিয়া মরিতেছি? কেন ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, কেন অধোমুখে রহিয়া, কেন কঠোর-কৃচ্ছ্র উগ্র তপঃসাধনায়, প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি? ঈশ্বর কত দূরে? ঈশ্বর কোথায়?

* * *

কেন ঘুরি?

দেবীমন্দিরে গিয়া যখন লোলজিহ্বা করাল-বদনা কালী কলুষ-নাশিনীর আরাধনা করি; পতিতপাবনী পুণ্যপ্রবাহিনী গাঙ্গিনীর ক্রোড়ে অবগাহন করিয়া যখন কলুষ-নাশ-আশায় অনুপ্রাণিত হই; চণ্ডীমণ্ডপ-শোভাময়ী

দিগন্তজ্যোতিঃবিচ্ছুরণ-কারিণী জননীর আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-নিক্কণে যখন নাচিয়া উঠি; কিম্বা যখন, প্রয়াগে পুষ্করে, বারাণসী হরিদ্বারে, সেতুবন্ধে গঙ্গাসাগরে, তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়াও পরিতৃপ্তির প্রার্থী রই; তখনও কেন মনে হয় না,—'আমি' কি?—আমি কেন ঘুরিয়া মরিতেছি?

* * *

'আমার' স্বরূপ।

'আমার' স্বরূপ-তত্ত্বটুকু বুঝিলে, আর এ ঘোরে ঘুরিতে হয় না। প্রথম বুঝিতে হয়—'আমি' কি? এই যে অস্থিমাংসমেদমজ্জাপিণ্ড দেহ—এই দেহই কি আমি? অথবা, আমি বলিতে অপর কিছু আছে? আর, এই যে লাভালাভ-জয়পরাজয়-সুখদুঃখ প্রভৃতির ছায়া-মূর্ত্তির পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া মরিতেছি,—ইহাই বা কি? সকলই অমূলক কল্পনা নহে কি? যাহা ছিল বা যাহা আছে, যাহা থাকে বা যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ—তাহাই প্রকৃত! সংসারে 'সৎ' ব্যতীত অপর কোন্ বস্তু থাকিতে পারে? অস্তিত্ব—'সৎ' সামগ্রীর; সত্তা—সৎ-বস্তুর।

* * *

অনুসরণে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবান্, সখা অর্জ্জুনকে অতি বিশদভাবে এই 'সৎ'-প্রসঙ্গ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়াছিলেন,—"যে যে পদার্থ বিকারের মধ্যে গণ্য, তৎসমস্তই বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা পদার্থ—অর্থাৎ কিছুই না। কিন্তু যাহার বিকার, সেই জিনিসটিই সত্য পদার্থ। সেই সত্য পদার্থটিকে নানা-প্রকারে ব্যবহার করার নিমিত্ত নানা-প্রকার নাম দেওয়া হইয়া থাকে এবং সেই এক

একটি নাম মাত্র লইয়াই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কল্পনা করা হয়। বাস্তবিক পক্ষে উহা কিছুই নহে। মনে কর, লোকে ঘট বলিয়া একটা জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকে; আর উহা যে মৃত্তিকাখণ্ড হইতে বিভিন্ন-মত দ্রব্য, তাহাও সকলের ধারণা আছে। কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে, ঐ ঘটটি কি মৃত্তিকা অপেক্ষা অতিরিক্ত কোনও পদার্থ বলিয়া নির্ণয় করা যায়? তাহা কদাচ নহে।"

* * *

মূল পদার্থ।

আরও একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মৃত্তিকাও মূল পদার্থ নহে। কত সূক্ষ্মাদপি-সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সংযোগে যে ঐ মৃত্তিকার উৎপত্তি, তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ সকল সামগ্রীরই আদি-ভূত, অণু হইতে অণু, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, "সত্তার অনুভব হয়। উহা নানা নহে, একই সত্তা সকল বস্তুতে অনুভব হইয়া থাকে, এজন্য অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাটিই সৎ, নিত্য বা সত্য এবং অদ্বিতীয় পদার্থ।" দেহাদির ন্যায়, সুখদুঃখাদি মানসিক ভাব-পরম্পরাও বিকারভূত; সুতরাং অসৎ। না বুঝিয়া, 'অসৎ' বস্তুর মায়া-মরীচিকায় অহর্নিশ কেন ঘুরিয়া মরিতেছি? কেহ বুঝিতেছি না বা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি না যে, প্রকৃত বস্তুটি কি?

* * *

সোঽহং।

জগদীশ্বর ওতঃপ্রোতঃ সর্ব্বজীবে সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান আছেন; তিনি অনন্ত অসীম অবিনশ্বর। শ্রীভগবৎমুখপঙ্কজবিনিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সত্তা-প্রসঙ্গ অনুধাবন করিয়া দেখিলে মনে হয় না কি—আমিও তিনি,

তুমিও তিনি, সাগর-ভূধর-চরাচর-স্থাবর-জঙ্গম সবই তিনি। ভাব তিনি, ভাষা তিনি, সুখ তিনি, শান্তি তিনি, সব তিনি। মূলে যখন সব এক, তখন আমি-ঈশ্বর হইয়া তুমি-ঈশ্বরের দ্বারে করযোড়ে কিসের প্রাথনা করি? বস্তু-তত্ত্বের বিশ্লেষণে যাহা দেখিতে পাইলাম, তাহাতে কাহার প্রার্থনা, কিসের প্রার্থনা, সে প্রার্থনা পূরণ করিবারই বা সামর্থ্য কার? সব 'আমি' – 'সোঽহং'—ঈশ্বর সর্ব্বময়।

—— * ——

অনন্ত।

স্বরূপ কি?

জগদীশ্বর!—তোমার কোন রূপ? আমরা তোমার কোন রূপের অনুসরণ করিব? মানব-সমাজ অনন্ত কাল হইতে এই সংশয়-দোলায় দোলায়মান্ হইতেছে। কত নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, কত নবনব শাস্ত্র-সমুচ্চয়, কত রকম রকম বাক্-বিতণ্ডা,—পৃথিবীর জন্মকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে জটিলতা আজিও টুটিল না।

* * *

সৎ ও অসৎ।

যাহা সৎ বা প্রকৃত, অজ্ঞতা-নিবন্ধন অনেক সময় তাহা উপলব্ধি হয় না। আবার যাহা অসৎ বা অপ্রকৃত, ভ্রম-মোহে তাহাই সৎ বলিয়া প্রতীত হয়। মিথ্যা বেতাল দর্শন, বালকের নিকট সত্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া, তাহার ভয়-রোদনাদি ও মৃত্যু পর্য্যন্তের কারণ হইতে পারে। বিচার দৃষ্টির অভাবে, শুক্তিতে রজত-বুদ্ধি ও মরীচিকায় জল-বুদ্ধি —অসৎ হইলেও সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয় না কি? ইহাই অসৎ,

ইহাই অবিদ্যা, ইহাই মায়া। অতএব, যিনি সৎস্বরূপ, তাঁহার অনুসন্ধান করিতে হইলে, সদসৎ জ্ঞান-লাভ অগ্রে প্রয়োজন।

* * *

সোঽহং।

'সোঽহং'—আমিই সেই। জগৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড এক। হিন্দুশাস্ত্র জগদীশ্বরের এই এক স্বরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। শাস্ত্রের একটী সুন্দর উপমায় ব্রহ্মের সৎ-ভাব কেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, দেখুন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—কেহ সুবর্ণ ক্রয় করিতে আসিলে বিক্রেতা যদি তাহাকে সুবর্ণের অঙ্গুরীয়ক প্রদান করে, ক্রেতা তাহা সুবর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে; 'ইহা সুবর্ণ নহে, অঙ্গুরীয়ক নামা স্বতন্ত্র পদার্থ' এই ভাবিয়া তাহা অবশ্য কখনও প্রত্যর্পণ করে না; কেন না, তাহাতেই তাহার সুবর্ণ-ক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অতএব, সুবর্ণই সত্য, তাহা অঙ্গুরীয়ক রূপ ধারণ করিয়াছে মাত্র। সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মও তদ্রূপ অহম্ভাবে প্রতিভাত হন।

* * *

অনন্তত্ব।

তাঁহার কত রূপ—কত গুণ—কত বিবর্ত্তন! তাই তিনি নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকার! এই মানুষ, কয় দিনের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে?—কতটুকু লীলা-খেলার অবসরই বা আছে তার? তারই মধ্যে দেখ,—কত রূপ, কত গুণ, কত পরিবর্ত্তন! কিন্তু প্রাণটুকু সেই আছে, আত্মাটুকু সেই আছে, অঙ্গুরীয়কের সুবর্ণটুকু সেই আছে। ক্ষুদ্র একটু পতঙ্গের—নিমেষে নিমেষে কত পরিবর্ত্তন হয়, কেহ লক্ষ্য করিয়াছ কি? কমল-কোরক, পত্র-ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া

ছিল; দেখ—দেখ, কেমন প্রস্ফুট শতদলে বিকসিত হইল! নবীন-নীরদ-নীলিম-মাঝে সহসা চারু-হাসিনী সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটা স্ফূরিত হইল!—আহা, কত রূপান্তর! হেমন্তের ক্ষীণাঙ্গী তটিনী, প্রাবৃটের জলকল্লোলে নবযৌবনে ঢলঢল করে!—দেখ, তারও কত রূপ-পরিবর্ত্তন! রূপের ন্যায় গুণেরও অশেষ পরিবর্ত্তন। রূপ—অনন্ত, গুণ—অপরিসীম। জগদীশ্বর সেই রূপ-গুণের আধার।

* * *

হিন্দুর দেবতা।

তাই আমি যদি বালার্ক-তরুণ অরুণ-মূর্ত্তি দেখিয়া জগদীশ্বরের রূপ মনে করিয়া ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, তাই আমি যদি হিমগিরির তুষার-ধবল শৃঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বিরাট্ কল্পনায় অনুপ্রাণিত হই, তাই আমি যদি উত্তাল বীচিসঙ্কুল মহাসাগরের বিশালতা দেখিয়া তদীয় বিশালতার ছায়া কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি, সাকারবাদী হিন্দু আমি, আমার মনে হয়, তাহাতে তাঁহারই উদ্দেশে আমার অভিবাদন করা হইতেছে। আমি যখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপ-ত্রিতয়ে তাঁহার আরাধনা করি, আমি যখন কালী-তারা-মহাবিদ্যা-ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তিতে তাঁহার পূজা করি, আমি যখন 'জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী মা' বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হই, তখনও কি তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে? তিনি অনন্তে এক, একে অনন্ত; তাই হিন্দুর অগণ্য অসংখ্য তেত্রিশ কোটী দেবতা। হিন্দু তাই জড় অজড় স্থাবর অস্থাবর পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ নদ নদী অরণ্য পর্ব্বত সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন।

—•—

মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

নাম-পীযূষ।

কলিপাবন মহাপ্রভু, জীবের গতি-মুক্তির অভিনব পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সে পথ—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনে মুক্তিলাভ হইবে,—ইহার অধিক সরল শিক্ষা আর কি হইতে পারে? দয়াল প্রভু, জীবের যন্ত্রণায় যন্ত্রণা অনুভব করিয়া, করুণার এই স্বচ্ছ সুশীতল অনন্ত নির্ঝর উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এস ভাই, পাপী তাপী যে যেখানে শুষ্ককণ্ঠ তৃষার্ত্ত আছ, একবার সেই নাম-পীযূষ পান করিয়া শান্তিলাভ কর।

* * *

ভগবদ্ভক্তি।

নাস্তিক্য-বুদ্ধি কূট-তার্কিক!—বিশ্বাস হইল না?—নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সুফল-লাভের সম্ভাবনা দেখিতে পাইলে না? কিন্তু দেখ, তোমার প্রত্যয়ের জন্য দয়াল ঠাকুর তাহাও কেমন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া গেলেন! নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কি সুফল-লাভ হয়, প্রত্যক্ষ অনুধাবন কর। মহাপ্রভু কহিতেছেন,—

"চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনম্,
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্,
সর্ব্বাত্মা-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥ ১॥

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥ ২॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
আমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৩ ॥

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ সদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥ ৭ ॥

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

* * *

শিক্ষাষ্টক।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব আপন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান নাই। সময়ে সময়ে তিনি কতকগুলি শ্লোক ও পদাবলী উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহা কতক কতক রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেই উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকাষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা শ্রীচৈতন্যের "শিক্ষাষ্টক" নামে অভিহিত হয়। ঐ আটটি শ্লোকের মধ্যে কি গভীর গূঢ় ভাবই নিবদ্ধ আছে। ঐ শ্লোকাষ্টকে মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের পরিচয়—কেমন সুন্দর পরিব্যক্ত পরিস্ফুট রহিয়াছে! নামসঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞ কিরূপে সমাধান করিতে হয়, ঐ শ্লোকাষ্টকে তাহাই প্রদর্শিত।

* * *

নামকীর্ত্তন।

শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বা কার্য্যকারিতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'শ্রীকৃষ্ণের নাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা চিত্ত দর্পণ মার্জ্জিত (পরিষ্কৃত) হয়, ভব-রূপ মহাদাবাগ্নি (দহন) নির্ব্বাপিত (শান্ত) হয়, শ্রেয়ঃরূপ কুমুদ-বিকাশকারী ভাব-জ্যোৎস্না বা চন্দ্র-কিরণ বিতরিত হয়। ঐ নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে, আনন্দ-সমুদ্র পরিবর্দ্ধিত হয়, প্রতি পদক্ষেপে পূর্ণামৃতের আস্বাদন লাভ হয়। নাম-সঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্বাত্মস্নিগ্ধকারী অবগাহন-স্বরূপ ; অর্থাৎ, সুশীতল সলিলে অবগাহন দ্বারা যেরূপ তাপতপ্ত দেহ স্নিগ্ধ হয়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনে পাপ-তাপ-দগ্ধ প্রাণ সেই স্নিগ্ধতা লাভ করে।' এই বলিয়া মহাপ্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জয়-ঘোষণা করিয়াছেন।

* * *

নাম ও কাল।

কিন্তু এই নাম-সঙ্কীর্ত্তনে নানা সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি, অচ্যুত, মুরারি, নারায়ণ—শ্রীভগবান অসংখ্য নামে অভিহিত। তাঁহার উপাসনা-সম্বন্ধে সময়ও নানারূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্ত তাঁহাকে কোন্ নামে কোন্ সময়ে কি বলিয়া আহ্বান করিবেন? সমস্যার বিষয় বটে! সেই সমস্যা নিরসনের জন্যই দ্বিতীয় শ্লোকের অবতারণা। এই শ্লোকে মহাপ্রভু কহিলেন,—'হে ভগবান! তোমার সর্ব্বশক্তি-প্রভাবে তুমি বহু নাম গ্রহণ করিয়া আছ, এবং সে নাম স্মরণে কোনও কালাকালের বাধাও রাখ নাই। আমার প্রতি তোমার এমনই অপরিসীমা করুণা! কিন্তু আমার বিষম দুর্দ্দৈব যে, তোমার সুধাময় নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না!' সংসারে ভগবানের নাম উচ্চারণে কতই বিঘ্ন উপস্থিত হয়!

সেই বিঘ্ন—দুর্দ্দৈব। শাস্ত্রে নামাপরাধজনিত দশবিধ (সাধুনিন্দা, শিব কৃষ্ণ-ব্রহ্মাদিতে ভেদ-বুদ্ধি প্রভৃতি) দুর্দ্দৈবের বিষয় লিখিত আছে। সেই সকল দুর্দ্দৈব পরিহার-পূর্ব্বক যে কোনও কালে ভগবানের যে কোনও নাম-কীর্ত্তন করিবে, তাহাতেই ফললাভ হইবে,—দ্বিতীয় শ্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য।

* * *

অহৈতুকী ভক্তি।

তৃতীয় শ্লোকে কি ভাবে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ব্রতী হইতে হইবে, শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নাম-সঙ্কীর্ত্তন-কারীকে তৃণের ন্যায় লঘু হইতে হইবে, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা অব-লম্বন শিক্ষা করিতে হইবে, অভিমানবর্জ্জিত হইয়া আমানী জনকেও মান্য করিতে হইবে। যাঁহারা এমন হইয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সমর্থ হন, তাঁহাদেরই সঙ্কীর্ত্তন সার্থক। তার পর, প্রার্থনার বিষয়। মানুষ সাধারণতঃ 'আমায় ধন দেও, ঐশ্বর্য্য দেও, সম্মান দেও'—ইত্যাদি-রূপ প্রার্থনাই করিয়া থাকেন। চতুর্থ শ্লোকে মহাপ্রভু তাই প্রার্থনার বিষয় উপদেশ দিতেছেন। বলিতেছেন,—'হে জগদীশ! আমি যেন ধন-জন বা সুন্দরী কবিতার কামনায় বিভোর না হই। আমি যেন জন্ম-জন্মান্তরে তোমাকেই লাভ করি, তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে পারি।' ভগবানের প্রতি এই অহৈতুকী ভক্তি কি প্রকারে প্রদর্শিত হইতে পারে, শাস্ত্রকারগণ টীকাকারগণ তাহা নানাপ্রকারে বুঝাইয়া থাকেন। উদাহরণ-স্বরূপ তাঁহারা বলেন—জগতের হিত-সাধন দ্বারাও ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রকাশ পায়। জীবে দয়া—অহৈতুকী ভক্তির একতম নিদর্শন।

* * *

নামকীর্ত্তন। পঞ্চম শ্লোকে জীবের সাধারণ অবস্থার বিষয় এবং ষষ্ঠ শ্লোকে নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবে সে অবস্থার পরিবর্ত্তনের আভাষ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—'হে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আমি বিষম সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জমান। আমার উদ্ধারের আর অন্য উপায় নাই। দয়া করিয়া আমাকে আপনার চরণসরোজের ধূলিকণার মধ্যে গণ্য করুন; তাহা হইলেই আমি উদ্ধার পাই।' এই প্রার্থনা জানাইয়া পরিশেষে কহিতেছেন,—'হে ভগবন্! তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নে প্রেমাশ্রু নির্গত হইবে, তোমার নাম উচ্চারণে কবে আমার গদগদ-কণ্ঠ বাক্যরুদ্ধ হইবে, কবে আমার দেহ পুলকে কণ্টকিত হইতে থাকিবে।' ইহাকেই বলে—নাম-গ্রহণ! ইহাকেই বলে—নামকীর্ত্তন! নচেৎ, কেবল তোতাপাখীর ন্যায় নাম উচ্চারণ করিলেই হইল না! নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে, যখন দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু-পাতে বক্ষ প্লাবিত হইবে, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেহ পুলকপূর্ণ হইবে,—তাহাকেই বলে নাম-কীর্ত্তন।

* * *

মৃতসঞ্জীবনী। অষ্টম শ্লোকে—পরিণতি বা শেষ অবস্থার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তখন প্রার্থনীয় হইবে,—'চরণ ধরিয়া রহিলাম। কৃপা করিয়া আলিঙ্গন করিতে হয়, আলিঙ্গন কর; রাগান্বিত হইয়া পদদলিত করিতে হয়, পদ-দলন কর; দেখা দিতে হয়, দেখা দেও; অথবা, অদর্শনে মর্ম্মাহত করিতে হয়, মর্ম্মাহত কর! অর্থাৎ, —'যাহাতে তাঁহার সুখ, তাহাই আমার সুখ-সৌভাগ্য; তিনি

আমার প্রাণনাথ প্রাণপতি; তিনি আমার পর নহেন।' এই ভাবই অভেদ-ভাব। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে, মানুষ ক্রমশঃ এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। ইহা বুঝাইবার জন্য ঐ শ্লোকাষ্টক—শিক্ষাষ্টক—মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছিল। নাম-সঙ্কীর্ত্তন—খেলার সামগ্রী নহে—উপেক্ষার বিষয় নহে :—উহাই একরূপ মৃতসঞ্জীবনী-মন্ত্র।

—— * ——

দৈব ও পৌরুষ।

দৈব, কি পৌরুষ ?

প্রাক্তন, কি পুরুষকার? সংসার কতকাল হইতে তর্ক-তরঙ্গে প্লবমান্ রহিয়াছে। জানি না, সমাধান কবে হইবে—কে করিবে? 'বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ঃ বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।' মানুষ কোন্ পথে কোন্ পদাঙ্ক অনুসরণ করিবে?

* * *

কৃতিত্বে।

সংসারে যাহারা হতাশের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিয়ত বিপর্য্যস্ত হইতেছে, দেখিতে পাই, দৈবের দোহাই তাহাদেরই মনঃপ্রবোধের হেতুভূত। আবার যাহারা অত্যল্প-আয়াসে কৃতিত্ব-কিরীটে বিভূষিত হয়, 'পুরুষকার' প্রতিধ্বনিতে তাহারাই গগন বিদীর্ণ করে। তবে কি দৈব ও পুরুষকার—অকৃতী-কৃতীর অধিষ্ঠানভূত?

* * *

প্রয়োজন।

যাহাই হউক, দেখিতে হইবে—এই আধিব্যাধি-শোকতাপ-নিলয় সংসারে—দৈব কি পুরুষকার—ইহার কোন্‌টিকে নিরবচ্ছিন্ন অবলম্বন করিয়া মানুষ তিষ্ঠিতে

পারে! শাস্ত্র অতি স্থূল দৃষ্টান্তেই দেখাইয়াছেন,—'গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? ভোজনকর্ত্তারই তৃপ্তিলাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়।' দৈবে নিশ্চিন্ত থাকিয়া আমরণ পণ—মানুষিক ক্ষমতায় সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও, কচিৎ দেখিতে পাই।

* * *

শাস্ত্রে—দৈব।

দৈবের বিরুদ্ধ-বাদ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন যে,—"কালবিদ্‌গণ যাহাকে অতি চীরজীবী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, সে ব্যক্তি যদি ছিন্নমস্তক হইলে জীবিত থাকে, তাহা হইলে (বলিব বটে) দৈব উত্তম! দৈবজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে—'এই ব্যক্তি পণ্ডিত হইবে'; কিন্তু তাহাকে অধ্যয়ন না করাইলেও যদি সে পণ্ডিত হয়, তাহা হইলে বলিব, 'দৈবই উত্তম!' নচেৎ, আকাশের সহিত যেমন শরীরীর সঙ্গ হইতে পারে না, সেইরূপ মূর্ত্তিহীন দৈবের সহিত কারকান্তরের সংযোগ সম্ভবে না; মূর্ত্তিমান্ পদার্থদ্বয়ই পরস্পর সংযুক্ত হয়; অতএব দৈব নাই।" শাস্ত্রের মতে,—অন্ততঃ দৈব সংসারীর নহে, সংসারে উহা পুরুষকারের ফল মাত্র।

* * *

স্বরূপ তত্ত্ব।

যদি দেখা যায়, পুরুষকার ব্যতীত মানুষ এ সংসারে তিষ্ঠিতে পারে না এবং পুরুষকারের আশ্রয়ই মানুষের উপযোগী; তবে আরও দেখার আবশ্যক হয়—সে কি প্রকার পুরুষকার? তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীরামচন্দ্রের নিকট কুলগুরু বশিষ্ঠদেব পুরুষকারের এইরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন;—

"সংবিৎ-স্পন্দ (তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ), তৎপরে মনঃস্পন্দ (পুরুষার্থ সাধনেচ্ছা), পরে ইন্দ্রিয়-স্পন্দ (অঙ্গচালনার্থ কর্ম্মেন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি); —এই তিনটী পুরুষার্থের স্বরূপ।" অন্যত্র আরও কহিয়াছেন,— "বেদাদি শাস্ত্র, সদাচার দ্বারা প্রকাশিত দেশধর্ম্ম (সদনুষ্ঠান) দ্বারা যে চিরপ্রসিদ্ধ চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানরূপ ফল লাভ হয়, তাহা হৃদয়ে উপনত হইলে, তৎসাধনেচ্ছা ও তৎপরে তদর্থ শরীর-চেষ্টা হয়, ইহাকেই পৌরুষ বলিয়া থাকে। অতএব, জীবগণ স্বাভাবিক ঐহিক পৌরুষকেই কার্য্যসিদ্ধির উপায়-রূপে যে গণ্য করে—তাহাও ভ্রান্তি।"

* * *

শাস্ত্রের উপদেশ।

তাই শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন,—"বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথে প্রবাহিত। পৌরুষ-প্রযত্ন দ্বারা উহাকে শুভ পথেই যোজিত করিতে হইবে। প্রাণীর চিত্ত শিশুর ন্যায় অস্থির; তাহাকে অশুভ হইতে অপসারিত করিলে শুভ-পথে গমন করে। অতএব, চিত্তকে বলপূর্ব্বক শুভ-পথে পরিচালিত করিতে হইবে।" প্রকারান্তরে ইহাই পুরুষ-কার। সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সন্তোষ, সাধুসঙ্গ, বিচার, শম—সংসার-সমুদ্র-তরণের এই চারিটি তরণী-স্বরূপ; পৌরুষ-বলে ইহার একটির আশ্রয় অবলম্বন করিলেই সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। "যেমন মহাপোত-সকল সমুদ্রেই গিয়া থাকে, সেইরূপ সাধুসঙ্গ সন্তোষ ও বিচার অতি সাবধানভাবে শমগুণ দ্বারা নির্ম্মলীভূত ব্যক্তির নিকট গমন করে।" পৌরুষ-প্রভাবেই দৈব অধিগত ও সঞ্চিত হয়।

মহামিলন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।

তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

দুঃখ-নাশে। জন্ম-জরা-মৃত্যুর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে সংসার মুহ্যমান। তাপতপ্ত জীবের আকুল-ক্রন্দনে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সুখ কোথায়, শান্তি কোথায়, এ দুঃখের অবসান হয় কি প্রকারে,—পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ হইতে সংসারের সকলেই সেই অনুসন্ধানে বিব্রত রহিয়াছে। জীব মাত্রেরই লক্ষ্য এক,—কিসে দুঃখ দূর হয়, কিসে সুখসাধন সম্ভবপর! এ ভিন্ন সংসারে আর অন্য চিন্তা নাই। এই একই লক্ষ্যে অনন্ত-কোটী প্রাণী নিয়ত উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। জীবের প্রতি কর্ম্মে—প্রতি পদবিক্ষেপে—প্রতি অনুষ্ঠানে, দুঃখ-নাশের প্রবল স্পৃহা প্রত্যক্ষীভূত।

* * *

লক্ষ্য অভিন্ন। যাহারা বন্য-পশুর ন্যায় আম-মাংস-ভক্ষণে ফল-মূল অন্বেষণে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদেরও যে লক্ষ্য; আবার সংসার পাতিয়া পুত্র-পরিজন পরিবেষ্টিত হইয়া সৌধ-অট্টালিকায় যাঁহারা বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদেরও সেই লক্ষ্য। সর্ব্বত্যাগী যোগী—ঐ যে সিংহ-ব্যাঘ্র-সমাকুল ভীষণ অরণ্যে, নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ অচঞ্চল অবস্থায় দিনযাপন করিতেছেন—শরীরে বল্মীক-স্তূপ সঞ্চারিত হইতেছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহারই বা কি লক্ষ্য! তিনিও কি আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-পূর্ণ সংসারের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভের জন্য—দুঃখ-নাশে সুখ-সাধনের আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত

নহেন? ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম, মহান্ হইতে মহত্তম—যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, সকলেরই সেই একই উদ্দেশ্য—একই লক্ষ্য।

* * *

পথ বিভিন্ন।

লক্ষ্য এক। উদ্দেশ্য অভিন্ন। কিন্তু পথ অনির্দ্দিষ্ট। একই উদ্দেশ্য—একই লক্ষ্য লইয়া সকলেই ঘুরিতেছেন বটে; কিন্তু পথের বিভিন্নতায় অভীষ্ট-ফল-লাভে বিঘ্ন ঘটিতেছে,—বিলম্ব আসিতেছে। কেহ ইহ-জন্মেই ইষ্ট-লাভ করিতেছেন; কেহ জন্ম-জন্মান্তরেও—জঠর-যন্ত্রণার পর জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও, তাহাতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই পরীক্ষা-পারাবারে নিমজ্জমান হইয়া, আশা-নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া, কত অবাস্তব কল্পনা বাস্তব-রূপে পরিণত হইতেছে, কত বাস্তব সামগ্রী অবাস্তব মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছে! আস্তিক, নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি অসংখ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি-পরিপুষ্টি এই হইতেই। বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব-কোলাহল চলিয়াছে, তাহারও কারণ—এই ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

* * *

কর্ম্মই মূল।

ধর্ম্মের জটিল তত্ত্ব লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিবার আবশ্যক নাই! দর্শন-শাস্ত্রের কঠোর বাদ-প্রতিবাদে চিত্ত-চাঞ্চল্য উৎপাদনেরও প্রয়োজন দেখি না। কোন্ পথ সুগম, কোন্ পথ দুর্গম,—সেই সন্ধানে জীবন অতি-বাহিত করায়ও শ্রেয়ঃ দেখি না। কতকগুলি সরল সার সত্যের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিলেই ইষ্টলাভ হইতে পারে। মানুষের কৃত-কর্ম্মের উপরই তাহার সুখ-দুঃখ নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্ব-

জন্মের কর্ম্ম প্রাক্তন বা অদৃষ্ট-রূপে যাহা ব্যবস্থিত, তাহা হইতে পরিত্রাণ-লাভের উপায় নাই সত্য ; কিন্তু ইহ-জন্মের কর্ম্ম-প্রভাবে সে অদৃষ্টের গতি যে কথঞ্চিৎ রোধ করিতে না পারা যায়,—তাহা নহে। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মকে নাশ করিতে পারা যায়। কর্ম্ম-ফলেই আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ সঞ্চিত হয় ; কর্ম্ম-প্রভাবেই তাহার ধ্বংস-সাধন হইতে পারে। সুতরাং, আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ-দুঃখ দূর করিয়া সুখ-সাধনে প্রয়াসী হইলে, কর্ম্মের সহায়তাই প্রধান' আবশ্যক ;—কর্ম্ম ভিন্ন জীবের দুঃখ-নাশের উপায়ন্তর নাই।

* * *

সুখ-সাধক।

কিন্তু কর্ম্ম-সম্বন্ধেও মতান্তরের অবধি নাই। কর্ম্ম—কর্ম্মও হইতে পারে, আবার অকর্ম্মও হইতে পারে। কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম এবং কোন্ কর্ম্ম অকর্ম্ম, তাহা স্থির করিতে অতি-বড় পণ্ডিতের চিত্তও অনেক সময় ভ্রান্তপথ পরিগ্রহ করে। কিন্তু সদন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কর্ম্মাকর্ম্ম-নির্ণয়ে বড় বিষম সমস্যায় পড়িতে হয় না। কতকগুলি কর্ম্মের উপযোগিতা সকল সমাজের সকল ব্যক্তিই স্বীকার করেন। বিপন্নের বিপদুদ্ধারে কাহার না আকাঙ্ক্ষা হয় ? অনশনক্লিষ্ট দরিদ্রকে অন্নদান জন্য কাহার প্রাণ না কাঁদিয়া উঠে ? এইরূপ কতকগুলি সদ্বৃত্তি সদ্ভাব সকলেরই প্রাণে উন্মেষ দেখি। সত্য, দয়া, পরোপকার, অহিংসা প্রভৃতি সদ্বৃত্তি-নিচয়ে স্বাভাবিকী স্পৃহা সকলেরই অন্তরে প্রত্যক্ষী-ভূত। যদি আর কিছু না পারি, এই সকল সদ্বৃত্তির অনুশাসনে যদি কর্ম্ম করি, সে কর্ম্ম নিশ্চয়ই কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত হইবে। স্থূলভাবে মানুষ যদি এইটুকু বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে পারে, তাহার

অভীষ্ট ফল—দুঃখনাশে সুখলাভ অবশ্যম্ভাবী হয়। এই কর্ম্মানুষ্ঠান আর একটু উপরের দিকে প্রধাবিত হইলে, মানুষ অপরকে আপনার জন বলিয়া ভাবিতে শিখে,—অপরের সুখদুঃখে আপন সুখদুঃখ অনুভব করে। তাহাতে ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের উদয়ে মানুষ মুক্তির বা অনন্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে।

* * *

কর্ম্মের সমুদ্র। সকলকে আপনার বলিয়া মনে কর! সর্ব্বজীবে সমভাবে প্রীতিমান হও! সাধ্যাসাধ্য নাই;—যতটুকু সামর্থ্য, যতটুকু সম্ভবপর, ততটুকু করিয়া আপনার ভাবিতে তো অন্তরায় নাই! কেন বিভ্রান্ত হই? কেন পথ অনুসন্ধান করিয়া পাই না? সম্মুখে কর্ম্মের এমন মহান্ ক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; অথচ, আমরা কর্ম্ম খুঁজিয়া পাই না! পরসেবা, পরপ্রীতি, পরদুঃখে দুঃখানুভব, পরসুখে সুখানুভূতি,—সম্মুখে আত্মজ্ঞান-রূপ কর্ম্মের অনন্ত সমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে! আমাদের সদ্বৃত্তি-রূপ ক্ষুদ্র জলবিন্দু-সমূহ সেই অনন্ত মহাসমুদ্রে সম্মিলিত হইবার জন্য প্রধাবিত হইবে না কি? কর্ম্মের অনন্ত নদী—অনন্ত জল-প্রবাহ—সমুদ্রাভিমুখী। এ বিন্দু কি সে প্রবাহে মিলিত হইতে পারিবে না? জীবনের এক একটী সদ্বৃত্তি এক একটী প্রবাহ-স্বরূপ। সকল সদ্বৃত্তি যদি একত্র মিলিত হয়, একাভিমুখে প্রধাবিত হয়, ভাবনা কি? সেই সদ্বৃত্তিসমূহের স্রোতোবেগে আপনা-আপনিই নদী-মহানদীর সৃষ্টি হইবে; আর তাহাতেই অনন্ত-সাগরে মিলিত হইতে পারিব। শেষে এমন হইয়া আসিবে, তখন আর ভিন্ন-ভাব থাকিবে না,—সব এক হইয়া যাইবে। সিন্ধু মহাসাগরে মিশিবে।

দুঃখ-তাপ-রূপ পঙ্কিলরাশি তখন অনন্তের অনন্ত গর্ভে বিলীন হইবে। সুখ—অনন্ত সুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তখন সেই স্বর্গীয়, সেই মধুর ভাব উপস্থিত হইবে, যে ভাবে—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"

সমুদ্রাভিমুখে যাত্রাকালে নদী-উপনদী-সমূহের নানা নাম-রূপ থাকে। কিন্তু যখন তাহারা সমুদ্রে গিয়া সম্মিলিত হয়, তখন তাহাদের নাম-রূপ লোপ পায়। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিগণেরও সেই অবস্থা। মানুষ যখন অবিদ্যার মোহে অভিভূত থাকেন, কর্ম্মাকর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না; তখন তাঁহাদের নানা নাম-রূপ পরিকল্পিত হয়; তখন তাঁহারা অন্যকে আপনার বলিয়া অভিন্ন-ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না; সুতরাং তখন সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে তাঁহা-দিগকে ওতঃপ্রোতঃ বিজড়িত থাকিতে হয়। কিন্তু যখন তাঁহারা কর্ম্মের পথ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাদের আত্মজ্ঞান সঞ্চার হয়; সকল কষ্ট, সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, নাম-রূপ বিবর্জ্জিত হইয়া, তখন তাঁহারা অক্ষয় অনন্ত পুরুষের অঙ্গে আত্মলীন করিতে সমর্থ হন। তখন আর জন্মজরা-মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না, তখন আর আধি-ব্যাধি-শোক-তাপে প্রপীড়িত হইতে হয় না। তখন আনন্দ—চির-আনন্দ লাভ হয়। সেই অবস্থায় উপস্থিত হইতে হইলে যে পথে অগ্রসর হইতে হইবে, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে; সে কর্ম্ম—সে পথ এত সরল—প্রশস্ত। তথাপি মানুষ কেন বিভ্রান্ত হয়? জানি না—আত্মজ্ঞানের এ দিব্যজ্যোতিঃ কতদিনে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিভাত হইবে?

——*——

বিশ্বরূপ।

"নমো নমস্তেহস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

সর্ব্বময়।

হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বাত্মন! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সর্ব্বদর্শিন! তোমাকে নমস্কার করি! আমার পুরোভাগে তুমি, পশ্চাদ্দেশে তুমি, বামে তুমি, দক্ষে তুমি, পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-অগ্নি-বায়ু-নৈর্ঋত-ঈশান-উর্দ্ধ-অধঃ দশ দিকে তুমি,—আমি তোমায় নমস্কার করি! এক বার, দুই বার, শত বার, সহস্র বার, বার বার তোমায় নমস্কার করি। পুরুষ-প্রধান অর্জ্জুন এই মন্ত্রে এই ভাবে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন,—এই মন্ত্রে এই ভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। নরদেহ ধারণ করিয়াও তাই তিনি বিরাট্ বিশ্বরূপ দর্শন করেন,—

* * *

নমস্কার।

সে আদর্শ মর্ত্ত্যভূমে নরজীবনে কি আশার আলোক প্রদর্শন করিতেছে! সংসার-তাপ-তপ্ত হতাশ-দগ্ধ প্রাণ, যদি এক বার সেই আলোক-রশ্মির অনুবর্ত্তন করিতে পারে, যদি এক বার সেই নর-দেবতার পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করিয়া শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণত হইতে পারে, তাহার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। অর্জ্জুনের ঐ নমস্কারের মধ্যে কি মহান্ ভাব—কি মহতী শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে! ঐ নমস্কার—দিব্যজ্ঞান-স্ফুরণের পরিচায়ক। ঐ নমস্কারে—'তিনি সর্ব্ব, তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান, সুতরাং তিনি

আমার কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন' ;—এবংবিধ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিলাভ হইয়াছিল বুঝা যায়। যেথানে এতাদৃশ জ্ঞান-স্ফূর্ত্তি, সেথানে শান্তির হিল্লোল স্বতঃ-প্রবাহিত নহে কি?

* * *

কর্ম্মজীবনে।

কর্ম্মময় মানব-জীবন। কর্ম্ম ভিন্ন মানবের অস্তিত্বই সম্ভবে না। 'সু' ও 'কু' বা 'সৎ' ও 'অসৎ' ভেদে কর্ম্ম দ্বিবিধ। কর্ম্মপর জীবনকে হয় 'সু' নয় 'কু' অথবা 'সু' ও 'কু' দ্বিবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবেই হইবে। সেই কর্ম্মের মধ্যে সু-কর্ম্ম বা সৎকর্ম্ম যে শ্রেয় এবং কুকর্ম্ম অকর্ম্ম বা অসৎ কর্ম্ম যে অশ্রেয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কর্ম্মাকর্ম্মের ভেদাভেদ-বিষয়ে কচিৎ মত-পার্থক্য থাকিতে পারে ; কিন্তু সৎকর্ম্ম যে শ্রেয়ঃসাধক এবং অসৎকর্ম্ম যে অনিষ্টোৎপাদক, মানুষ-মাত্রেই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ম্মজীবনের কর্ম্মগুণে যে সদসৎ গতি সঙ্ঘটিত হয়, তদ্বিষয়েও বড় মতান্তর নাই। তাই অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলেও, সৎকর্ম্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ স্বতঃই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

* * *

ফলভোগ।

সু-কর্ম্মের সুফল, কু-কর্ম্মের কুফল, সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান্। তথাপি মানুষ কেন কু-কর্ম্মের কু-পথে প্রধাবিত হয়? তাহার কারণ,—প্রলোভন ও অজ্ঞতা। প্রলোভন সুকর্ম্মেও যে আসে না, তাহা বলি না। তবে অজ্ঞতা-নিবন্ধন প্রবৃত্তি কুকর্ম্ম-পথেই প্রধাবিত হইয়া থাকে। পাপের পথে পদক্ষেপ করিবার সময় মানুষ প্রথমে মনে করে,— 'কেহ বুঝি জানিল না, কেহ বুঝি বুঝিল না, কেহ বুঝি দেখিল না।'

সে পথ বড় পিচ্ছিল ; তাই যেই পদক্ষেপ করে, অমনি সর্‌সর্‌ করিয়া অগ্রসর হইয়া পড়ে। শেষে এমন হয়, তখন আর ফিরিতে পারে না ;—অবসাদে ফিরিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিতে সামর্থ্য আসে না। সুতরাং কুকর্ম্মের অসৎকর্ম্মের পরিণাম ফল যাহা, তাহা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

* * *

প্রণিপাত কর।

সেই যে অজ্ঞতা, যে অজ্ঞতা-নিবন্ধন মানুষ কুকর্ম্মের কুপথে প্রথম প্রলুব্ধ হয়—সেই যে অজ্ঞতা,—সে অজ্ঞতা দূর করিবার উপায় কি কিছু নাই ? উপায় আছে বৈ কি! উপায় অতি সহজ—অতি সুসাধ্য। উপায়,—জীবনের প্রারম্ভ হইতে অর্জ্জুনের অনুসরণে ভগবচ্চরণে প্রণিপাত করিতে অভ্যাস করা! অর্জ্জুন যেমন বিশ্বরূপ-দর্শনে শ্রীভগবানের সর্ব্বময়ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সম্মুখে পশ্চাতে বামে দক্ষে সর্ব্বদিকে সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান দেখিয়া "নমো নমোস্তেঽস্তু" ইত্যাদি স্তোত্রে বন্দনা করিতে পারিয়াছিলেন ;—মানুষ যদি তাহাই পারে,—সর্ব্বত্র তিনি আছেন এবং সকলই তিনি দেখিতেছেন—এই বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্ হইয়া মানুষ যদি তাঁহাকে প্রণাম করিতে শিক্ষা করে, তাহাতেই তাহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পূর্ব্বে যে অজ্ঞতার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে সে অজ্ঞতা দূরীভূত হয় ;—কুকর্ম্মের প্রলোভনে মন আর প্রলুব্ধ হয় না। সুতরাং মানুষের প্রথম শিক্ষা আবশ্যক—শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিতে শিক্ষা করা—তিনি সর্ব্বত্র আছেন ও সকলই দেখিতেছেন বিশ্বাস করা।

* * *

সেই মন্ত্রে।

হিন্দুর সংসারে এইরূপ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা আবহমান্ কাল বিহিত আছে। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই সার তত্ত্ব জানিয়াও, হিন্দু যে অসংখ্য অগণ্য তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহারও এক প্রধান লক্ষ্য—ঐরূপ জ্ঞানোন্মেষের চেষ্টা বলিয়া মনে হয় না কি? বৃক্ষে তিনি আছেন, শিলাখণ্ডে তিনি আছেন, প্রতিমায় তিনি আছেন, সর্ব্বঘটে সর্ব্বত্র তিনি বিরাজমান্,—এ বিশ্বাসে যিনি বিশ্বাসবান্ হইতে পারেন, তিনি কখনই কু-কর্ম্মের পথে পদক্ষেপ করেন না,—সৎকর্ম্মেই তাঁহার জীবন-গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। 'তিনি দেখিতেছেন, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া আমার কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছেন' —এই মনে করিয়া মানুষ যেদিন কার্য্য করিতে শিখিবে; সেই দিন হইতে তাহার সকল ভাবনা সকল সংশয় সকল ভয় বিদূরিত হইবে;—এই আধিব্যাধিশোকতাপপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও মানুষ তখন চিরসুখ চিরশান্তি লাভ করিবে। মানুষের তাই প্রথম প্রয়োজন,—সেই মন্ত্রে শ্রীভগবানের চরণে প্রণত হইতে শিক্ষা করা,—অর্জ্জুন যে মন্ত্রে প্রণত হইয়া ডাকিয়াছিলেন,—

"নমো নমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নম পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।"

* * *

উপরে লক্ষ্য।

কিবা শাস্ত্রবাক্যে; কিবা মহাপুরুষগণের উপদেশবাণীতে, কত প্রকারে কত আকারে এই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত ও বিঘোষিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মহাপুরুষগণের প্রত্যেকের জীবনী—এই তত্ত্বেরই বিশ্লেষণ নহে কি?

প্রহ্লাদ দেখিলেন—জলে স্থলে অনলে অনিলে সর্ব্বত্র শ্রীভগবান দেদীপ্যমান্। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব—গভীর অরণ্যে সিংহশার্দ্দূলাদির অভ্যন্তরে জগজ্জ্যোতির দিব্য দ্যুতি দর্শন করিলেন। প্রেমের অবতার গোরা—কৃষ্ণ-প্রেমের পীযূষ-প্রবাহে জগৎ পরিমগ্ন দেখিলেন,—তাঁহার দৃষ্টিতে জগৎ কৃষ্ণময় হইল। এত উচ্চ দৃষ্টি—এত গভীর দর্শন—সাধারণ সংসারী নরকের কীটের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শাস্ত্র তাই সরল কথায় সহজ ভাষায় উপদেশ দিলেন,—"আর কিছু না পার, এক বার উপরের দিকে চাহিয়া দেখ! কর্ম্মময় জীবন, কর্ম্ম করিতে আসিয়াছ; কর্ম্ম করিয়া যাও;—কিন্তু উপরের দিকে যেন লক্ষ্য থাকে।" এই উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে কি সুন্দর পরিস্ফুট দেখি! দেবতা বলিতেছেন,—

"ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতা
পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েক্ষণতৎপরোঽপি।"

মানুষ! তুমি বিষয়-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে চাও, থাক;—তাহাতে তোমার কোনও অনিষ্ট নাই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একবার ভগবানের প্রতি চিত্ত ন্যস্ত করিও। ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত, ধীর ব্যক্তি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়াসক্ত থাকিলেও, কখনও মুহ্যমান্ হন না—কোনও বিষয়ে কষ্ট অনুভব করেন না। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়াসক্ত, অথচ ভগবানে নিবিষ্টচিত্ত,—এ কি সুমস্থার অবস্থা? মানুষের মনে সহজেই এরূপ একটা সংশয়-প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু সেই সংশয় নিরসনের উদ্দেশ্যে দেবতা উপমা দ্বারা বুঝাইতেছেন,—

"সঙ্গীতবাদ্যলয়তালবশাং গতাপি
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব॥"

যেমন কোনও নৃত্যশীলা রমণী, মস্তকে কুম্ভসহ নৃত্য করিবার সময়, সঙ্গীত-বাদ্য-লয়-তাল প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মস্তকস্থিত কুম্ভকে অচঞ্চল রাখিবার জন্য তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাদবিক্ষেপ করে; মানুষেরও সেইরূপ, সাংসারিক কর্ম্মঘোরে বিব্রত থাকিবার সময়, "উপরে ভগবান আছেন—আমার কর্ম্মাকর্ম্ম তিনি সকলই দেখিতে পাইতেছেন" এই মনে করিয়া কর্ম্ম করা আবশ্যক। তাহা হইলে, সেই দৃষ্টিতে কর্ম্ম করিতে পারিলে, মানুষের আর পদস্খলনের আশঙ্কা কিছুই থাকে না। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব প্রায় সর্ব্বদাই আপনার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন,—"ওরে! কর্ম্ম করিস্; কিন্তু উপরের দিকে লক্ষ্য রাখিস্।" উপমা-স্বরূপ তিনি আরও কহিতেন,—"ঐ দেখ, খোট্টা মেয়ে, কোলে ছেলে, হাতে ঘটি, মাথায় কলসী, জল নিয়ে উচুনীচু পথে কেমন অগ্রসর হচ্ছে! দুটী হাত যোড়া, তাই লক্ষ্য—মাথার কলসীটীর প্রতি। তোরাও কি এমনিভাবে কাজ করতে পারিস্ না? কাজ কর আর দেখ্—উপরের দিকে চেয়ে!" মানুষ!—তুমি সুখ খোঁজ, শান্তি খোঁজ, আর সেই উদ্দেশ্যে কর্ম্ম কর; এক বার উপরের দিকে চাহিতে পার না কেন? তাহা হইলে দিব্য দৃষ্টিলাভ করিবে। দিব্য দৃষ্টির ফলে সদসৎ কর্ম্মাকর্ম্মের মর্ম্ম কথা বুঝিতে পারিবে। সংসারের বৃথা কর্ম্ম আর তোমায় আচ্ছন্ন রাখিতে পারিবে না। কুকর্ম্ম—অসৎকর্ম্ম আপনিই পরিহার করিতে পারিবে; সুকর্ম্মের সুফল আপনা-আপনিই তোমার অধিগত হইবে।

—*—

মা! মা!

"রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

শত্রুনাশ কর!

আশ্বিনে মহামায়ার আগমনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-কালে ভক্ত প্রার্থনা করে,—"মহাশক্তিরূপিণি মা! শত্রু নাশ কর মা।" এই প্রার্থনাই প্রধান প্রার্থনা। ইহার পর ভক্তের কামনা,—'শত্রু নাশ করিয়া, মা তুমি, জয় দেও—যশ দেও—রূপ দেও।' অনাদি কাল হইতে শত্রুর উপদ্রব চলিয়াছে, অনাদি কাল হইতে রক্তবীজের বংশ প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতে ভক্ত-সন্তান এইরূপ 'পরিত্রাহি' ডাক ডাকিতেছে, আর অনাদি কাল হইতে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া শক্তিরূপিণী-মা শত্রু-সংহার করিয়া আসিতেছেন। দ্বন্দ্ব চিরদিনই আছে; দ্বন্দ্ব চিরদিনই থাকিবে; মাতৃ-আবাহনের আবশ্যকতাও চিরদিনই অনুভূত হইবে।

* * *

অসংখ্য মূর্ত্তি।

শত্রু অসংখ্য—অগণ্য। কত ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়া, কত নব নব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, সে যে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইয়াছে,—কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? দেহের মধ্যে শত্রু—আধি-ব্যাধি-রূপে আক্রমণ করিয়া আছে; অন্তরের মধ্যে শত্রু—হিংসা-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপু-রূপ পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে; সংসারের চারিদিকে, জলস্থলমরুদ্ব্যোমে, শত্রু—অহি-নক্র-

শ্বাপদাদি কত মূর্ত্তিই ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছে! এবংবিধ পরিদৃশ্যমান্ নানা মূর্ত্তির উপর, তাহার আর এক সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ ভীষণ মূর্ত্তি আছে। সে মূর্ত্তি—তাহার মায়া-মূর্ত্তি।

* * *

মানবী-মায়া।

সকল শত্রুর পার আছে। কিন্তু মানবী মায়া-রূপ ভীষণতা উল্লঙ্ঘন করা অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধি-ব্যাধি উপস্থিত হইলে, উপযুক্ত ভেষজের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, শান্তির সম্ভাবনা আছে। রিপু-দস্যু উত্তেজিত হইলে, সংযম-সাহায্য লাভ করিতে পারিলে, সে উত্তেজনা দমিত হইতে পারে। সাবধানতা অবলম্বনে, অহি-নক্র-শ্বাপদাদির উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি-লাভ অসম্ভব নহে। দৈব যে অলঙ্ঘ্যনীয়, যাগযজ্ঞাদি দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠানে তাহারও শান্তি-বিধানের উপদেশ আছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া পাই না,—মানবী-মায়া পরিহারের কি উপায় বিদ্যমান! সে যখন সৌহার্দ্দ্য জানাইয়া মিত্রবেশে আসিয়া অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, তখন স্বরূপ-তত্ত্ব কিছুই উপলব্ধি হয় না; কিন্তু পরিশেষে সে যখন হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরি হানিয়া প্রাণ-সর্ব্বস্ব লইয়া বাহির হইয়া যায়, তখন হা-হতাশে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করি! কখনও মিত্র-রূপে, কখনও ভ্রাতৃ-রূপে, কখনও পুত্র-রূপে, কখনও দয়িতা-রূপে—সে শত্রু কত-রূপেই যে প্রাণে শক্তিশেল হানে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় ক্ষোভেই তাই শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—'এ সংসারে কেহ কারো নয়।'

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীববিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

* * *

মানুষ-শত্রু। মানুষ-শত্রুই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ! অন্যান্য অনেক শত্রু এই শত্রু হইতেই উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে যে কাম-ক্রোধাদি রিপু-শত্রুর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এই মানুষ-শত্রু তাহাদের অনেকেরই উৎপত্তির মূলীভূত। তোমার কাম-প্রবৃত্তির উত্তেজনার জন্য, ঐ দেখ, সে কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে! তোমার ক্রোধের উদ্রেক কে করিতেছে? হৃদয়ে ঈর্ষা-দ্বেষ-অহঙ্কার-সঞ্চারের মূলেও তাহার প্রভাব পরিদৃশ্যমান্ নহে কি? সেই তো—কখনও মজাইতেছে, কখনও রাগাইতেছে, কখনও জ্বালাইতেছে! মজাইয়া, রাগাইয়া, জ্বালাইয়া, পথভ্রষ্ট করিয়া, তোমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিবে,—ইহাই তাহার সঙ্কল্প। সকল মানুষই যে দৈত্য-দানব ছদ্মবেশী, তাহা বলিতেছি না। তবে অধিকাংশ মানুষে যে প্রেত-পিশাচ আশ্রয় করিয়া আছে,—ইহাই বুঝিতে হইবে। আর তাই, মানুষ-চেনা বড়ই কঠিন। তুমি তোমার চারিদিকে যাহা-দিগকে মানুষ-রূপে দেখিতেছ, তাহারা সবাই তো মানুষ নয়!—তাহাদের অনেকেই নরদেহধারী তোমার পরম শত্রু প্রেত-পিশাচ। তাই বলি মানুষ এ সংসারে যদি তুমি শ্রেয়ঃ চাও, আগে মানুষ চিনিবার চেষ্টা পাও। মানুষ চিনিতে না পারিলে, যাহাকে তাহাকে মানুষ ভাবিয়া মানুষ-রূপী শত্রুর কবলগত হইলে, তোমার ধ্বংসের পথ কেহই অবরোধ করিতে পারিবে না। আমরা যাহাকে যন্ত্রণা বলিয়া মনে করি, সে আধি-ব্যাধির তাড়না—সে তুলনায় কিছুই নয়। যদি মুক্ত হইতে চাও, আগে

মানুষ চিনিয়া লও;—আধি-ব্যাধির তাড়নার বিষয় ভাবিবার দিন পরে আছে। সেই মানুষ-চেনার ফলই—সৎসঙ্গ-লাভ।

* * *

শত্রুনাশ।

দেবগণ যে জগজ্জননীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, অমরপুরে যে মহাশক্তিরূপিণী মহিষমর্দ্দিনীর আবাহন-অর্চ্চনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল;—সে আর কিছুর জন্য নয়,—সে এই মানুষশত্রুর কবল হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্যই। অসুর আর কাহারা? চণ্ডমুণ্ড মধুকৈটভ প্রভৃতিই বা কে ছিল? এই নর-রূপেই তাহারা বিদ্যমান ছিল ও বিদ্যমান রহিয়াছে। সে রক্তবীজের বংশ কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কি? তাই সে কালেও প্রার্থনা শুনিয়াছিলাম,—"রক্তবীজবধে শত্রুনাশ কর মা!" আজিও সেই প্রার্থনারই প্রতিধ্বনি উঠিতেছে,—"শত্রুনাশ কর মা!" ভক্তের সম্বল—ভক্তাধীনার অনুকম্পা। সেই অনুকম্পা-লাভের উদ্দেশ্যেই শারদোৎসব। শারদোৎসবে মহাশক্তির পূজায় বলির ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে বলি যে কি বলি,—মানুষ সর্ব্বথা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। মহাশক্তির পূজায় বলি দিতে হইবে—বাহিরের শত্রু, অন্তরের শত্রু। বলি দিতে হইবে—কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্যাদি রিপুকুলকে; বলি দিতে হইবে—অসৎসঙ্গ অসদাচার প্রভৃতি শত্রুকুলকে। সেই বলিই প্রকৃষ্ট বলি; সেই পূজাই প্রকৃষ্ট পূজা। সেই বলিতে—সেই পূজাতেই—মহাশক্তির পরিতৃপ্তি। এই পূজায়—এই বলির যে প্রার্থনা, সেই প্রার্থনাই মায়ের প্রাণস্পর্শ করে।

—*—

গৌরচন্দ্র।

শুভক্ষণে।

বড় শুভক্ষণে বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল! অজ্ঞান-অমার গাঢ়-আঁধারে সংসার ঘেরিয়া ছিল; সাধু-সজ্জন নিরাশ্রয় হইয়াছিলেন; দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতির প্রভাব দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। চৈতন্য-চন্দ্রের আবির্ভাবে সে অজ্ঞান-আঁধার দূরীভূত হয়, সাধু-সজ্জন আশ্রয় প্রাপ্ত হন, দুষ্কৃত-জনের দুষ্কৃতি দমিত হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন—'গৌর অবতার অবতার-সার।' যদিও তিনি বিশেষণ-বিরহিত, যদিও শ্রীভগবানে উচ্চ-নীচ লঘু-গুরু বিশেষণ অপ্রযুজ্য, তথাপি যে তাঁহাকে 'সার অবতার' 'শ্রেষ্ঠ অবতার' বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে; তাহার কারণ,—পাপ-পঙ্ক-নিমজ্জিত নিরাশ পাপী-তাপীর উদ্ধার তাঁহার কৃপায় সাধিত হইয়াছিল। তিনি কলি-পাবন; কলির নিরুপায় জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্যের পরিসীমা নাই।

* * *

অবতার-সার।

গৌরচন্দ্র যে আলোক বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, সে আলোকে কোন্ দৃশ্য-পট প্রকটিত দেখিলাম! দেখিলাম,—তৃণের ন্যায় অবনত-ভাব; দেখিলাম,—তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা; দেখিলাম,—অমানীকে মান-দান; আর দেখিলাম—সদা হরিনাম-কীর্ত্তন। দেখিলাম—বুঝিলাম—জীবের গতি-মুক্তির এই এক প্রকৃষ্ট পথ! শ্রীচৈতন্যের চরিত্র-চিত্রে এই পথ কি সুন্দর পরিদৃশ্যমান্! এমন সরল সুন্দর নিষ্কণ্টক পথ যিনি দেখাইয়া গেলেন, ভাবুক ভক্ত তাঁহাকে 'অবতার-সার' বলিয়া কীর্ত্তন না করিয়া

থাকিতে পারেন কি? আয়াস-বহুল বৈদিক যজ্ঞ-বিধির আড়ম্বর প্রয়োজন নাই; কৃচ্ছ্রসাধ্য তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপের আবশ্যক নাই; সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের পুণ্যশ্লোক মনীষিগণের অনুষ্ঠিত কঠোর ক্রিয়া-কর্ম্মের বা জ্ঞান-গবেষণার অনুসরণে উদ্‌ভ্রান্ত হইবার প্রয়োজন নাই;—অল্পায়ু অল্পবুদ্ধি জনের সামর্থ্যানুকূল এবম্বিধ অনুষ্ঠানের উপদেশ—এক গৌর অবতার ভিন্ন অন্য কোনও অবতারে পরিদৃষ্ট হয় না। গৌর অবতার তাই—'অবতার-সার'।

* * *

নিগূঢ় শিক্ষা।

তবে গৌরচন্দ্র যে তৃণের ন্যায় অবনত ভাব দেখাইতে বা তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে এবং আপনি 'নিরভিমানী' থাকিয়া অন্যকে মান দান করিতে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহারও মধ্যে এক নিগূঢ় শিক্ষা আছে। সহজ দৃষ্টিতে মানুষ সে নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারে না বটে; কিন্তু একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সে ভাব আপনিই অধিগত হয়। তিনি যেমন সহিষ্ণুতা প্রভৃতি শিক্ষা-দান করিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিমাণও নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন। অবনত হইতে হইবে বলিয়া, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া, আপনি নিরভিমানী থাকিয়া অন্যকে মান দিতে হইবে বলিয়া, তিনি কখনই মর্য্যাদার সীমা-লঙ্ঘন করেন নাই। অবনত হইবে কাহার নিকট? সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবে কোন স্থানে? আপনি নিরভিমান থাকিয়া অন্যকে মান দেখাইবে কোন্ ক্ষেত্রে? গৌরচন্দ্র দেখাইলেন—সেখানে নহে, যেখানে উচ্চ-মস্তক তাঁহাকে অবনত রাখিবার দাবী করিতেছে; সেখানে নহে, যেখানে বলদর্পিত জন তাঁহাকে সহিষ্ণু হইবার

জন্য বাধ্য করিতেছে; সেখানে নহে, যেখানে সম্মানের অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া মানী মান পাইবার দাবী রাখিতেছে। তিনি অবনত—অবনত জনের নিকট; তাঁহার সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণু-জনের নিকট; তিনি মান দেন—অমানী জনে। গৌরচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, কেবল কোমলতা নহে, কেবল মধুরতা নহে, কোমলে-কঠোরে, কষায়ে-মধুরে, মিশ্রণ-ভাবেরই অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিতে পাই। তাই গোরা—ভক্তের চক্ষে—'অবতার-সার'।

* * *

গৌর-চরিত্রে।

গোরার চরিত্রের একটি আভাষ প্রদান করিতেছি। তাহাতেই বুঝিতে পারিবেন—তিনি কেমন কোমলে কঠোর—মধুরে তীব্র। গৌরচন্দ্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ধামে গমন করিয়াছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র গজপতি তাঁহার সাক্ষাৎকারের অভিলাষী। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রভুকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছেন। পার্ষদগণ কত বুঝাইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র, প্রভুর দর্শন জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছেন, সে ব্যাকুলতার কথা প্রভুর চরণে নিবেদন করা হইল। প্রভু মনে মনে হাসিলেন; উত্তর দিলেন,—

"তোমাসভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা।
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটক যাইয়া॥
পরমার্থ যাউ, লোকে করিবে নিন্দন।
লোক রহু, দামোদর করিব ভর্ৎসন॥
তোমাসভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি—তবে মিলি তারে॥"

লোক-নিন্দার কথা কহিলেন; দামোদর ভৎ´সনা করিবে বলিলেন। ইহার পর, কত বিতর্কের কথা উঠিল। সেই সকল বিতর্কের পর দামোদর কহিলেন,—

"রাজা তোমায় স্নেহ করে তুমি স্নেহবশ।
তার স্নেহে করাবে তারে তোমার পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র॥"

কিন্তু ইহাতেও মন ভিজিল না। নিত্যানন্দ স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন—মহাপ্রভুর মনের ভাব ব্যক্ত হইল।

"নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে—কর রাজারে মিলন॥
কিন্তু অনুরাগিলোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ ছাড়য়॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িল পরাণ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমিহ না মিল তারে, রহে তার প্রাণ॥"

যাওয়া হইল না। রাজার পক্ষ হইতে অনুরোধ করিতে আসিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া সার্ব্বভৌম প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যিনি তৃণের ন্যায় সুনীচ হইতে শিক্ষা দেন, এ ক্ষেত্রে তাঁহার মস্তক অবনত হইতে পারিল না। রাজার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইল।

* * *

সারতত্ত্ব।

সার্ব্বভৌম প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার মন প্রবোধ মানিল না। তিনি মন্ত্রীকে পাঠাইলেন। রাজমন্ত্রী রামানন্দ রায় সমাদরে প্রভুকে লইতে আসিলেন।

"রাজ-মন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ।
রাজার প্রীতি কহি, দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভুপদে করিল নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥"

কিন্তু প্রভু কি উত্তর দিলেন, অনুধাবন করিয়া দেখুন।

"প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া।
রাজারে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া॥
"রাজার মিলনে যেন ভিক্ষুর দুইলোক নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥"

প্রভু বুঝাইলেন,—'আমি সন্ন্যাসী; আমি কেন রাজ-সন্নিধানে যাইব? পরলোক তো পরের কথা! ইহলোকেই লোকে উপহাস করিবে না কি?' শুনিলেন—কি উত্তর? যিনি আচণ্ডালে কোল দিতে গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি কৃমিকীট-পূর্ণ গলিত-কুষ্ঠকে কোল দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, রাজ-মন্ত্রীর মুখের উপর তিনি এই উত্তর দিলেন!

"রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র॥"

কিন্তু ইহাতেও প্রভুর মন টলিল না!

"প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্য ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥"

কি মহান্ শিক্ষা! যিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, রাজার তাঁহার

কি প্রয়োজন? সেই রাজার রাজা যাঁহার অধিগত; তিনি সামান্য রাজার সাক্ষাৎকারে প্রলুব্ধ হইবেন কেন? রামানন্দ রায় অভিনব যুক্তির অবতারণা করিলেন।

"রায় কহে—কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি।।"

কিন্তু প্রভু তাহাতে কি উত্তর দিলেন?

"প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ।।
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্।
তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজ' নাম।।"

এই উক্তির মধ্যে কি নিগূঢ় ভাব নিহিত রহিয়াছে! প্রতাপরুদ্র —রাজা; রাজা বলিয়া, রাজ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে, তিনি প্রভু-সন্নিধানে আগমন করিতে সঙ্কুচিত; সুতরাং তিনি অতি-বড় ভক্ত হইলেও তাঁহার কার্য্য অহমিকা-শূন্য নহে। ভগবান্ ভক্তির ডোরে বাঁধা; তিনি নন্দের 'বাধা' মস্তকে ধারণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন; কিন্তু অহঙ্কারের ছায়াস্পর্শে স্বতঃবিমুখ। গৌরচন্দ্র—পাপিত্রাতা, পতিতের উদ্ধার-কর্ত্তা; তিনি অহমিকের নহেন, রাজার নহেন। তিনি তৃণের ন্যায় অবনত; তিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু; তিনি আপনি নিরভিমানী থাকিয়া অপরকে মান দেন; কিন্তু সর্ব্বত্র নহে;—তাঁহাতেও পাত্রা-পাত্র নির্ব্বাচনের চিত্র প্রকট দেখি। কে বলে—তিনি সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞ ছিলেন? কে বলে—তিনি ভেদাভেদ মান্য করি-তেন না? কে বলে—তিনি সমাজ-ধর্ম্ম লোকাচার মানিতেন না? প্রোক্ত উদাহরণে তাঁহার চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য

অভিব্যক্ত নহে কি? এই চিত্রেই বুঝিতে পারি, তিনি সাধু-সজ্জনের পরিত্রাণ জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; অহঙ্কৃত দুষ্কৃত-জন তাঁহার নিকট বিনাশ-প্রাপ্ত, সুতরাং উপেক্ষিত হইয়াছিল। যে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তাহার আবির্ভাব, সে ধর্ম্মের তিনি কি সরল সুন্দর সুগম পথই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন! তিনি দেখাইয়াছেন—'বড়'র পশ্চাতে ফিরিয়া দীনতা-প্রকাশ ধর্ম্ম নহে। দীনতা ও সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। আপন জীবনে আপন কর্ম্মে প্রভু তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের এই শিক্ষা—এক মহতী শিক্ষা। এই তত্ত্ব যাঁহার অধিগত হইবে, তিনিই শ্রেষ্ঠপদ লাভ করিবেন।

—— * ——

মঙ্গলময়ী।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।
শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

অনন্ত মূর্ত্তি।

সর্ব্বময়ী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী মা-আমার অনন্ত-মূর্ত্তিধারিণী। মা-আমার কখনও অন্নপূর্ণা-রূপে নিরন্ন জনকে অন্নদান করিতেছেন; মা-আমার কখনও ঘোরা ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যদলনে অগ্রসর হইতেছেন; আবার মা-আমার কখনও দশভুজা দুর্গামূর্ত্তিতে এক দিকে পাষণ্ড-দলনের বিভীষিকা উৎপাদনে, অন্য দিকে ভক্ত-জনে বরাভয়দানে, যুগপৎ কোমলে কঠোরে প্রকট রহিয়াছেন। কিন্তু যে ভাবেই আবির্ভূতা হউন, মাতৃস্নেহের পীযূষ-প্রবাহ

সর্ব্বভাবেই প্রবহমান রহিয়াছে। মা যখন হাস্যাননে অভয় প্রদান করিতেছেন, তখনও তাঁহার যে স্নেহের ও করুণার ভাব দেদীপ্যমান; তিনি যখন চামুণ্ডা-রূপে খর্পরধৃতকরা, তখনও তাঁহাতে সেই স্নেহ-করুণা পরিস্ফুট। সন্তানের কুকার্য্য কদাচার নিবৃত্তির জন্য, সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে, সন্তানের প্রতি জননী তাড়না-ভৎর্সনা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাড়না-ভৎর্সনা করিলেও মাতৃস্নেহ কখনই বিলুপ্ত হয় না। সন্তানের মঙ্গল-কামনা ভিন্ন জননীর দ্বিতীয় লক্ষ্য কিছুই নাই। সন্তান সদাচারী সুরূপই হউন, আর কদাচারী কুরূপই হউন, জননীর স্নেহের ধারা সমভাবে সন্তানের প্রতি বর্ষিত হয়।

* * *

সর্ব্বমঙ্গলময়ী। দেবী ভগবতীর—কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি অসংখ্য মূর্ত্তির মধ্যে মাতৃস্নেহ কি সুন্দর প্রকটিত রহিয়াছে! মা স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া করুণা বিতরণ করিতেছেন,—সেখানেও তাঁহাতে যে মাতৃভাব; আবার তিনি রেষাকষায়িত লোচনে বিকট হুঙ্কারে যে বিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছেন,—সেখানেও সেই মাতৃভাব! সকল অবস্থায় সর্ব্বত্র তাঁহার লক্ষ্য—সন্তানের মঙ্গলসাধন। তাঁহাকে নৃমুণ্ড-মালিনী ভীষণায়ুধধারিণী বিভীষণা মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া কলুষিত চিত্ত ত্রস্ত হইতে পারে,—অজ্ঞানী নাস্তিকের মনে অসদ্ভাবের সঞ্চার হইতে পারে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে, সেই ভীষণা মূর্ত্তির মধ্যেই করুণার অমৃত-নির্ঝর নিঃসৃত হইতেছে—দেখিতে পাই না কি? যাঁহারা দেবীমাহাত্ম্য অভি-নিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মনে কখনই

মাতৃস্নেহে কোনরূপ সংশয়ের ভাব উদয় হইতে পারে না। দেবী সর্ব্বমঙ্গলবিধায়িনী; তিনি সকলের হিতসাধনে প্রযত্নবতী। তিনি "সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা"; তিনি সকলের উপকার করিবার জন্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দয়ার্দ্রহৃদয়। তাঁহাতে কি কখনও অমঙ্গলের আশঙ্কা স্থান পাইতে পারে? তিনি শত্রুর ভয়-প্রদায়িনী বটেন; কিন্তু মনোহারিণী। তিনি পাষণ্ডদলনে পাষণ্ডাচার-বিদূরণে প্রচণ্ডা বটেন; কিন্তু করুণারূপিণী।

* * *

মার করুণা। দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী, জগজ্জননীর যে স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতেই মার এই অপার করুণার বিষয় বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে, স্থূল-বুদ্ধিতে, মানুষ মনে করে,—মা যেন একদেশদর্শী; তিনি দেবতাদিগের প্রতি অত্যধিক দয়াশীলা এবং অসুরগণের প্রতি সমধিক নির্য্যাতনপরায়ণা। যিনি জগজ্জননী, যিনি সকলের মাতৃরূপিণী, তাঁহাতে এ ভাবান্তর কেন? এ সংশয় অজ্ঞজনের অনেকেরই মনে উদয় হয়। সুতরাং অনেকেই মার স্নেহ-করুণার প্রতি সন্দিহান হন। কিন্তু স্বরূপ-তত্ত্ব কি? চণ্ডীতেই সে তত্ত্ব পরিব্যক্ত আছে;—

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা॥
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে কুর্ব্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রামমৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়াস্তু মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি॥
দৃষ্টৈব (দৃষ্ট্বৈ) ব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম সর্ব্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতি সাধ্বী॥"

"হে দুর্গে! তোমাকে স্মরণ করিলে সকল প্রাণীরই সর্ব্ববিধ ভয় বিনাশ তুমি করিয়া থাক; (বিশেষতঃ) সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে তাহাকে অতীব সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক; হে দারিদ্র্যহারিণি! হে দুঃখহারিণি! হে ভয়হারিণি! সকলের উপকার করিবার জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় তোমা ব্যতীত আর কে আছে? হে দেবি! এই অসুরগণ নিহত হইলে, জগৎ সুখী হয়—অতএব চিরকাল নরকজনক পাপ করিলেও সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিয়া ইহারা স্বর্গলাভ করুক—নিশ্চয় এই বিবেচনা করিয়াই শত্রু অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছ। আপনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই অসুরগণকে ভস্মীভূত করিতে পারিতেন, তথাপি সেই শত্রুগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; কেন-না, 'শত্রুরা অস্ত্রাঘাত-প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া উৎকৃষ্টলোকে গমন করুক'—শত্রুগণের প্রতিও আপনার এইরূপ উদার বুদ্ধি আছে।"

* * *

সর্ব্বকার্য্যে।

করুণার পরিচয় ইহার অধিক আর কি হইতে পারে? "লোকান্ প্রায়ন্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা,"—শত্রুরা অস্ত্রাঘাত-প্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া উৎকৃষ্ট-লোকে গমন করুক; অসীম স্নেহের পরিচায়ক নহে কি? যে সকল সন্তান সদ্‌বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাদের মুক্তির পথ তো সরল সুগম হইয়াই আছে! কিন্তু যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি-পরিচালিত, তাহাদিগকে সুপথে আনয়নের পক্ষে শাসনের ব্যবস্থাই সর্ব্বত্র বিহিত হয়। দেবীর দৈত্যদলন-ব্যাপারেও সেই ভাব প্রকটিত দেখি। সদ্‌বুদ্ধি-পরিচালিত দেবগণ আপন কর্ম্মবলে মোক্ষলাভ করিতেছেন; কিন্তু বিপথগামী কদাচারী দৈত্যগণের উদ্ধারের উপায় কি?

মা সেই জন্যই চামুণ্ডারূপিণী ভীষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। দৈত্যগণকে বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকেও দেবভাবাপন্ন করিবেন, দেবত্ব দিবেন,—স্নেহশীলা জননীর ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। এ ভীষণ ভাব—মঙ্গলবিধায়ক। মা যে সর্ব্বমঙ্গলা, মা যে সর্ব্বার্থসাধিকা, মা যে সর্ব্বস্যার্ত্তিহারিণী, মার এই সকল বিশেষণের সার্থকতাই তাঁহার কালী তারা ভৈরবী মূর্ত্তিতে বুঝাইয়া দিতেছে। ত্রৈলোক্য মধ্যে জগজ্জননীর যে সকল সৌম্য ও অত্যন্ত ভীতিপ্রদ রূপ বিরাজমান, তৎসমস্তই সন্তানগণকে এবং পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য। ভক্ত তাই জগজ্জননীর নিকট অন্তরের প্রার্থনা জানাইতেছেন,—

"শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ ॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্ ॥"

* * *

আদর্শ।

সন্তানের মঙ্গল-বিধান জন্যই জননী যে ভীষণা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, কালী-মূর্ত্তির এক এক অংশের বিশ্লেষণে তাহা বড় সুন্দর উপলব্ধি হয়। দুই একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। অনেকের মনে অনেক সময় সংশয়-প্রশ্ন উঠে,—'শিবের বুকে শ্যামা কেন? যে মা দক্ষালয়ে শিবনিন্দা-শ্রবণে তনুত্যাগ করেন, সেই মা কেমন করিয়া শিবের বক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন! এ বড়ই বিসদৃশ ব্যাপার নহে কি?' এ প্রশ্ন অনেক সময়ই অনেকের মনে উত্থিত হইয়া থাকে। আজই যে এ প্রশ্ন নূতন উঠিতেছে, তাহা নহে; অনেক কাল হইতে

অনেক মনীষির সমক্ষে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। আর অনেকে অনেক রকমে এ প্রশ্নের সমাধান করিয়া গিয়াছেন। দুইটী উদ্ভট শ্লোকে এই প্রশ্ন ও ইহার উত্তর বড় সুন্দর পরিব্যক্ত আছে। সেই শ্লোক দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে, 'শিবের বুকে শ্যামা কেন'—এ প্রশ্নের অভিনব মীমাংসা দৃষ্ট হইবে।

প্রশ্ন,—"শিবস্য নিন্দয়া তু যা তাজম্বপুঃ স্বকীয়ম্।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ম শবে শিবে কিমদ্ভুতম্।।"
উত্তর,—"শিবপাদযুগ্মম্ শিবেঽস্তীতি বাচ্যং
ন বাচ্যং ন বাচ্যং ন বাচ্যং কদাপি।
মহাঘোরযুদ্ধে মহাঘোররূপা
পদস্পর্শমাত্রাৎ শিবোঽভূৎ শবাত্মা।।"

শিবনিন্দা-শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সতী কেমন করিয়া শবাবস্থায় অবস্থিত শিবের বক্ষে পদরক্ষা করিলেন?—ইহা বড়ই আশ্চর্য্য নহে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ভাবুক ভক্ত কহিলেন,—'না, না, তাহা নহে; ঐ যে শিবরূপে অবস্থিত শবদেহ দেখিতেছেন, উহারা শিব নহেন; উহারা দৈত্য-দানব। উহা-দিগকে যে শিব-রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, মার মোক্ষপ্রদ চরণস্পর্শে রণাহত দৈত্যগণ শিবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, তাই মার চরণতলে শিবরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি।' মার অপার করুণা! সেই করুণারই এই পরিচয়! উচ্ছৃঙ্খল সন্তান যখন উচ্ছৃঙ্খলা পরিত্যাগ করিল না, মা তখন এইভাবে তাহাদিগের উদ্ধার-সাধন করিলেন। অসুরগণ শিবত্ব লাভ করিল,—মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা নহে কি? ভক্ত তাই ডাকিতেছেন,—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।"

———◆———

আগমনী।

"প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥"

অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!

মা আসিতেছেন। দুর্গা দুর্গতিহারিণী মা-আমার আসিতেছেন। আহা!—দেখ—দেখ! মায়ের আমার কি অপূর্ব্ব মূরতি! সিংহবাহিনী, দনুজদলনী, মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, ত্রিভুবন-আলোক-কারিণী—মরি মরি কি জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! দশদিক্-প্রসারিত দশায়ুধপরিধৃত দশবাহুসমন্বিত, যুগপৎ-করুণা-ক্রোধ-পরিস্ফুরিত, রোষভয়-বিজড়িত, হাস্য-কটাক্ষ-উদ্ভাসিত—মরি মরি কি মধুরে-কঠোরে বিচিত্র সমাবেশ! এক দিকে দেখ—কি ভয়ঙ্করী, বিশ্বত্রাসকারী, দিগন্ত-গ্রাসকারী, সংহারিণী মূর্ত্তি! আবার অন্যদিকে দেখ—কিবা শান্তিস্বরূপিণী, ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারিণী, বরাভয়প্রদায়িনী, সুহাসিনী মূর্ত্তি! মা-আমার বৈচিত্র্যশালিনী—মা-আমার বহুরূপ-ধারিণী! যে জন যে ভাবে দেখিবে, যে জন যে ভাবে ভাবিবে, মা-আমার তাহার নিকট সেই ভাবে প্রকটিত আছেন।

* * *

কোটি রূপ।

মা-আমার ভক্তের নিকট একরূপ, অভক্তের নিকট একরূপ, পুত্রের নিকট একরূপ, শত্রুর নিকট একরূপ। একই মা, কিন্তু রূপ—লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী। সাধক, স্তিমিতনেত্রে বনারণ্যে বসিয়া, হৃদয়-মন্দিরে মার অধিষ্ঠান নিরীক্ষণ করেন; সংসারী, সংসার-কোলাহলের গণ্ডগোল-মধ্যে সোণার-প্রতিমা সযতনে সাজাইয়া, মণ্ডপমাঝে মার রূপ-প্রতিষ্ঠা করেন; কাহারও বা, মনোমাঝে, ভগ্ন-হৃদয়মন্দিরে, মা আপনি

আসিয়া, আসন-পরিগ্রহ করেন। যার আগমনে, শ্মশান-ক্ষেত্র শান্তিকুঞ্জে পরিণত হয়, বিপদ-অসুর ত্রাসে পলায়ন করে, রিপু-শত্রু বিমর্দ্দিত হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন—মার আমার নিত্যকার্য্য। ধরিত্রী যখন পাপভারে ভারাক্রান্তা হন, মেদিনী যখন অসুর-পদ-দাপে প্রকম্পিতা হন, ধরণী যখন দুঃখের পসরা বক্ষে করিয়া ব্যাকুলা হইয়া পড়েন, তখনই মা, অভয়া-রূপে অভয়-প্রদানে আবির্ভূত হন। সংবৎসরের জ্বালা-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া, বর্ষব্যাপী বিপদ-পরম্পরায় বিধ্বস্ত হইয়া, পাপাসুরের প্রবল-পীড়নে প্রপীড়িত হইয়া, আকুল-প্রাণী ব্যাকুল প্রাণে "মা" বলিয়া ডাকিয়াছে। মা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তাই মা আবার আসিতেছেন।

* * *

বিপদ ভালবাসি।

অভাবে পড়িয়া, বিপদে ভুগিয়া, সন্তান ডাকিয়াছে; তাই মা আবার আসিতেছেন। বিপদ!—তুমিই মাকে আনিয়াছ! অভাব!—তুমিই মাকে আনিয়াছ! হাহাকার!—তুমিই মাকে ডাকিয়াছ! আর্ত্তনাদ! —তোমারই কর্কশ-স্বরে মার-আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে! বিপদ! —তোমাকে তাই আমি ভালবাসি! হাহাকার!—তোমাকে তাই আমি আমার নিত্যসহচর করিয়া রাখিয়াছি! আর্ত্তনাদ!—তুমিই তো আমার তপ-জপ-পূজা-মন্ত্র সকলই! জান কি—এত যত্ন করিয়া কেন তোমাদিগকে আজীবন পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছি? বিপদের উপর নিত্য বিপদ—তবু তারে স্নেহালিঙ্গনে গৃহ-মন্দিরে কেন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছি! হাহাকার—অনন্ত হাহাকার—তবু তারে অণুমাত্র অনাদর নাই;—অতি যতনের ধন, হৃদয়ে হৃদয়ে অহর্নিশ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি! থাক'!—তোমরাই আমার

চিরবন্ধু—তোমরাই আমার চির-সহচর থাক'! তোমরা ছিলে বলিয়া তো মা-আমার আবার আসিতেছেন—মাকে আমি আবার দেখিতে পাইতেছি! তোমরাই ছিলে বলিয়া তো আঁধার বঙ্গভূমে মা-আমার আবার আসিতেছেন;—কোটী প্রাণীর শ্রান্তপ্রাণে মা-আমার আবার শান্তি দিতে আসিতেছেন। তোমরা না থাকিলে, এ বিলাস-বিভ্রম-গ্রস্ত বঙ্গভূমে, মাকে কে আনিতে পারিত? বিপদ!—তাই বলি, তুমিই আমার মাকে আনিয়াছ, তুমিই আমার পরম বন্ধু। সম্পদে তোমাকে মনে থাকে না, তাই মাকে ডাকিতে পারি না! বিপদে মাকে ডাকিয়া থাকি; বিপদেই মা আসিয়া অভয় প্রদান করেন। তাই বিপদ!—তোমাকে ভালবাসি।

* * *

বিপদবারিণী! কিন্তু ভাই, সহচর আমার, একটু অপেক্ষা কর, এক বার অন্তর্হিত হও। আমার মা আসিতেছেন। বৎসরে তিনটী দিন রাজা-প্রজা সকলেই, তাঁর পূজার জন্য ব্যাকুল; আমি কি তাঁরে একটীবারও দেখিব না? ভাই!—তুমিই মাকে-আমার আনিয়া দিয়াছ; তুমি এক বার কি তাঁরে দেখিতে দিবে না? বন্ধু!—তুমি এক বার বন্ধুর কাজ করিবে না কি? এক বার তাঁরে দেখিব, এক বার তাঁর পূজা করিব, এক বার মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিব,—এ অবসরটুকুও কি পাইব না? অহো!—বুঝিয়াছি! তুমি কে? মা আসিতেছেন;—এখন আর তুমি কে? মা যে নিজে বিপদহরা—দুর্গতিনাশিনী দুর্গা! মা আসিলে, সকল বিপদ দূরে যায়; শান্তি—অনন্ত শান্তি—মানুষ লাভ করে। তবে আর ভাবনা কি? মা! মা! তোর এ অভাগা সন্তানকে, একবার চরণে স্থান দে মা! তুই দয়া করিয়া

বৎসরের পর যদি আবার আসিলি মা, শান্তির নির্ঝর একবার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যা মা! অগ্নিস্রাবী মেঘের সঙ্গে যেমন প্রাণ-স্নিগ্ধকারী বারিবর্ষণ হয়, দুঃখদাবদগ্ধ অশান্তির মধ্যে তোর আগমনে প্রাণে তেমনই শান্তির ধারা বহিতে থাকে। মেঘ উঠিয়াছিল; তাই বারিবর্ষণ হইল। বিপদ আসিয়াছিল; তাই তুই আসিয়াছিস্। বিপদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিয়া, বিপদ দূর করিস্ বলিয়াই তো তুই বিপদবারিণী! শরণাগতের প্রতি প্রসন্না হ'মা,—লোক-সকলের প্রতি বরদায়িনী হ'মা!

—— * ——

আত্মাভিমানে।

মানুষ বড় কিসে?

মানুষ বড় কিসে? এই একটি ক্ষুদ্র প্রশ্নের উত্তরে, একদা কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—'মানুষ বড়—আত্মাভিমানে!' কি সুন্দর সত্য! এই অনন্ত বিশ্বের বক্ষে অনন্ত প্রাণী, বাজীকর হস্তে ক্রীড়নকবৎ, খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা সকলেই ক্ষুদ্র,—গণনার অঙ্কে সকলেই নিম্নস্তরে অবস্থিত! বড় কেবল—মানুষ! অন্ততঃ মানুষ সেইরূপ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ বড় কিসে? সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, মানুষ বড়—আত্মাভিমানে।

* * *

মানুষের শিক্ষা।

আজন্ম-সঞ্চিত অবসাদ, একদিনে ফুরায় না; যে জ্বালা জন্ম-সংস্কারলব্ধ সম্পত্তি, তাহা এক দিনে শীতল হয় না! যে সুখ অনন্ত অক্ষয়, তাহাও এক দিনে লাভ হয় না! কত কোটীজন্মসঞ্জাত ভূয়োদর্শনলব্ধ জ্ঞানের ক্রমশঃ-বিকাশে, কত উত্থান-পতন বিবর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া, মানুষ একটু

একটু করিয়া উন্নত হইতেছে। ঐ যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, একান্ত একাগ্রচিত্তে প্রজ্বলিত বহ্নিমুখে ছুটিয়াছে—কোন বাধা-বিঘ্ন-অন্তরায় মানিবে না, কেবলই তদ্গত-চিত্ত হইয়া ছুটিয়াছে—উহার নিকট হইতেও মানুষ শিক্ষালাভ করিতেছে। ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রাণের যে গভীর একাগ্রতা, উহার যে অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব—উহা মানুষকে চিরকালই শিক্ষা দিতেছে। এইরূপ অনন্ত প্রাণীর অনন্ত দৃষ্টান্ত মানুষকে শিক্ষা দিতেছে ; আর সেই শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে চিরবদ্ধমূল হইতেছে। তথাপি মানুষ—বড়! মানুষ বড়—আত্মাভিমানে!

* * *

সব অন্ধকার।

অনন্ত বীচিবিক্ষুব্ধ অনন্ত জলরাশি! কোথাও পর্ব্বত-প্রমাণ উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! কোথাও ঘন-কৃষ্ণ অতলস্পর্শ জলরাশির ভীষণ গাম্ভীর্য্য! কেবল জল—চারিদিকেই জল। ঊর্দ্ধে—অনন্ত ব্যাপিয়া কেবলই ঘনীভূত অন্ধকার! নিম্নে যেমন অনন্ত জলের সমুদ্র, ঊর্দ্ধেও তেমনই অনন্ত অন্ধকারের সমুদ্র। অন্ধকাররাশি ও জলরাশি যেন এক হইয়া দিগন্ত ছাইয়া রহিয়াছে! দৃষ্টির পথ রুদ্ধ। মানুষের ইন্দ্রিয়-সকল, সেখানে একেবারে স্তব্ধ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়,—কল্পনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতির এই ভীষণ রাজত্বে, ইতস্ততঃ দূরে ও নিকটে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নূতন-পুরাতন ভাল-মন্দ সুদর্শন-কুদর্শন যেন কয়েকখানি পোত ভাসিতেছে। আর দূরে—কল্পনার সাহায্য-ব্যতীত যেখানকার দূরত্ব অনুভব করা যায় না সেইখানে—একটি প্রকাণ্ড আলোকস্তম্ভ, জলরাশির উপর, ঊর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে, স্থির ও গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তরঙ্গাঘাত-বিতাড়িত পোতসমূহ, ঐ দূরস্থিত উজ্জ্বল

আলোকের প্রতি ছুটিয়াছে। কোনও আশা নাই, কোনও ভরসা নাই; অথচ, ভিন্ন ভিন্ন পোতে ভিন্ন ভিন্ন আরোহিগণ—কেহ বা রুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্ত হইয়াছে—কেহ বা দূর-দর্শন-বিহীন হইয়া কেবলই আত্মাভিমানে বড় হইতেছে! পোত-সমূহ, তরঙ্গের উপর উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আর ঘাত-প্রতিঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া নানা দিক হইতে কেবল চলিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য—এক। লক্ষ্য—সেই আলোকস্তম্ভ!

* * *

আলোকস্তম্ভ।

ঐ যে উজ্জ্বল সম্মোহন কোটীসূর্য্যদীপ্ত কোটী-চন্দ্রোৎফুল্ল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে; ঐ যে অনন্তকে আলোকিত করিয়া, দ্রুত-বিচ্ছুরিত রশ্মিজালকে কেন্দ্রীভূত করিয়া, অনন্তের পথিক ও পোতস্থিত ঐ নাবিকগণকে পথ-প্রদর্শন জন্য আলোকস্তম্ভ স্থির ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে;—উহাই একমাত্র লক্ষ্য, উহাই একমাত্র উদ্ধার-কেন্দ্র। ঐখানে যাইতে পারিলে,—ঐ যে কখনও শীতল, কখনও উষ্ণ, কখনও কোমল, কখনও কঠোর, কখনও শান্ত, কখনও চঞ্চল আলোক-রাশ্মি, উহারই নিকট যাইতে পারিলে,—মানুষ নিরাপদ হইতে পারিবে। যোজন-দূরবিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গরাশির অভিঘাত সহ্য করিয়া, সূচীভেদ্য তমোরাশি ভেদ করিয়া, সর্ব্বাসংহা কঠোরতায় শরীর আচ্ছাদিত করিয়া, ধীরে ধীরে, ঐ সাধারণ-কল্পনার-অতীত দূরস্থানে—যেখানে কেবলই আলোক, যেখানে সকলই শুভ্রতা, যেখানে কেবলই মঙ্গল—সেইখানে যাইতে হইবে; যেখানে সুখ নিত্য, যেখানে সত্য অনন্ত, যেখানে বাসনা বিজিত, যেখানে আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত, যেখানে কল্পনা প্রত্যক্ষ—সেইখানে যাইতে

হইবে। বিবিধবর্ণানুরঞ্জিত সুন্দর পতাকায় পোত সাজাইয়া, বহু মণি-মাণিক্যে ক্ষণবিধ্বংসী পোতদেহ খচিত করিয়া, কর্ত্তব্য ভুলিয়া, মিথ্যা মোহমদে আচ্ছন্ন হইয়া, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে চলিবে না। ঐ যে দূরে একখানি পোত, বায়ুভরে তরঙ্গের উপর হেলিতেছে, দুলিতেছে, আর বাহ্য-আড়ম্বরে ফুলিয়া ফুলিয়া দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিয়াছে,—উহাই কি ঐ দূরালোকলাভে সমর্থ হইবে? আরোহী অনেক; সকলেই নানারূপালঙ্কারবিভূষিত, সকলেই দর্পাভিমান-গর্ব্বিত, উহারাই কি কেবল আলোক-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে? আর ঐ যে একখানি ক্ষুদ্র-পোত, স্থিতির বহুদূরে অবস্থিত, কাতরতার ছায়া-মণ্ডিত হইয়া, ব্যাকুল একাগ্রতায় জীর্ণদেহে আলোকস্তম্ভের প্রতি ছুটিয়া চলিয়াছে;—উহা কি অনন্ত অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ্য হইবে না? কি জানি, কাহার ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে!

* * *

জাগরণ।

রবি অস্তগত হইলে, অন্ধকার-আবরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রমোদ-উদ্যানে যেমন বিলাস-ভোগ-বাসনা একে একে জাগিয়া উঠে, গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেলে অপহরণ-লোলুপ মনে যেমন আনন্দ নাচিয়া উঠে, মনুষ্যের হৃদয়েও তদ্রূপ, আত্মদর্শনালোক অস্তমিত হইলে, আত্মাভিমান পূর্ণ প্রসারিত হইতে থাকে। বুঝিবার সামর্থ্য দূরে অপসৃত হয়, ভাবিবার ক্ষমতা বিলীন হয়, কার্য্য মোহাবসাদ বিজড়িত হয়, সত্য দূরে পলায়ন করে। তখন কেবলই আড়ম্বর—তখন কেবলই অভিমান—ক্ষুদ্রের অভিমান, বৃহতের অভিমান, মিথ্যার অভিমান, কল্পনার অভিমান, জ্ঞানের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, ক্ষমতার

অভিমান, অক্ষমতার অভিমান, আর অভিমানের অভিমান—ঘোর অন্ধ আত্মাভিমান কখনও আপনাকে ক্ষুদ্র ভাবিতে পারে না! তখন এই ক্ষুদ্র মাটির পুতুল—যাহা প্রকৃতির ক্ষণিক ফুৎকারে উড়িয়া যায়, বারিবিন্দু-বিধৌত হইলে মুহূর্ত্তে গলিয়া যায়—এই বিধাতার খেলার পুতুল ক্ষুদ্র মানুষ, আপনাকে ভুলিয়া, সংসারকে ভুলিয়া, অনন্তকে ভুলিয়া, সব ভুলিয়া, আপনাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ভাবিয়া আত্মপূজা করিয়া থাকে। ভাবিবার অধিকার মানুষের আছে, তাই মানুষ ভাবিয়া থাকে; আর ভাবিতে পারে বলিয়াই, মানুষ ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, মিথ্যাকে সত্য, নশ্বরকে নিত্য বলিয়া মনে করে। ভাবিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, মানুষ বড়!—আত্মাভিমানে বড়!

* * *

তন্ময়চিত্ত।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, শুনিতে পায় না। মানুষেরও চক্ষু আছে, দেখিতে পায় না; কর্ণ আছে, শুনিতে পায় না; বুদ্ধি আছে, বুঝিতে পারে না। আছে সব; কিন্তু ভাবিতে গেলে, নিজস্ব কিছুই নাই। যাহা আপনার বলিয়া ভাবিতেছি, যাহাকে পাইয়া আত্মাভিমানে বড় হইতেছি, তাহা কয় দিনের জন্য—কাহার ক্ষমতা পরিচালিত? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি,—ক্ষিপ্ত আত্মাকে শান্ত করিয়া, সংযত করিয়া, আড়ম্বরের মিথ্যা ভাণ ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয়ের পথ রুদ্ধ করিয়া, নির্লিপ্ত-চিত্ত হইয়া, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! ঐ বহুদূরবিস্তৃত অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে ঐ যে চির-উজ্জ্বল চির-জ্যোতিষ্মান্ ধর্ম্মের আলোকস্তম্ভ—উহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া, একবার ভাবিয়া

দেখ দেখি—মানুষের আত্মাভিমান কিসের জন্য? সব মিথ্যা, সব নশ্বর। তাই ভগবান তারস্বরে বলিতেছেন,—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! মষ্যাবেশিতচেতসাং॥"

'অব্যক্তে নিষ্ঠা, দেহাভিমানীদিগের জন্য নহে। অব্যক্তে আসক্ত হইলে দেহাভিমানী ব্যক্তি বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর যাহারা মদেকহৃদয় হইয়া, আমাতে (ভগবানে) সর্ব্বকর্ম্ম ন্যস্ত করিয়া, ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে আমার (ভগবানের) ধ্যান ও উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারা অচিরকাল মধ্যে এই মৃত্যুদূষিত সংসার হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকে।' সুতরাং অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, ভগবানে একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতেই ন্যস্ত রাখিতে হইবে। সূর্য্যমুখী ফুল যেমন একাগ্রচিত্তে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে; উন্নতশীর্ষ তরুরাজি যেমন অনন্তের প্রতি মস্তক উন্নত করিয়া একাগ্রচিত্ত থাকে; ক্ষুদ্র পতঙ্গ যেমন একাগ্রচিত্তে বহ্নিমুখে প্রধাবিত হয়; বিপদের সময় নাবিকগণ যেমন দূরালোক-দৃষ্টে একাগ্রচিত্তে তৎপ্রতি পোতচালনা করে; সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা যেমন অনন্তকাল হইতে অনন্তের পথে একাগ্রচিত্ত হইয়া বসিয়া আছে;—মানুষকেও সেইরূপ একাগ্রচিত্ত হইতে হইবে, আত্মাভিমান বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সর্ব্বকর্ম্ম তাঁহাতে ন্যস্ত রাখিয়া

নির্লিপ্তভাবে তাঁহার ঐ অপূর্ব্ব আলোক-স্তম্ভের প্রতি চাহিয়া থাকিতে হইবে। তবে সাধনা সিদ্ধ হইবে—জীবের উদ্ধার হইবে, মানুষ প্রকৃত বড় হইতে পারিবে। বড়—আত্মাভিমানে হয় না। বড়—আত্মাভিমান-বিসর্জ্জনে।

—— * ——

প্রার্থনা-তত্ত্ব।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

একবার এস!

মা!—মা!—বিপন্ন ব্যথিত সন্তান কাতরকণ্ঠে কাঁদিতেছে! একবার এস!—একবার দেখা দেও!—একবার করুণনেত্রে চাও। যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না;—বিভীষিকা আর দেখিতে পারি না! এস মা! এক বার এস!—সন্তানের দুর্দ্দশা এক বার দেখিয়া যাও! দুঃখনিবারিণী, শরণাগত-পালিনী, নিখিল জগতের জননী!—তুমি উদাসিনী থাকিলে সন্তানের উপায় কি হইবে? মূঢ় সন্তান, মোহমদে মত্ত হইয়া, তোমায় বিস্মৃত হইয়া ছিল। তাই কি মা, অভিমানিনী হইয়া, সন্তানের প্রতি বিরূপ হইয়া আছ? ব্যথা না পাইলে, দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত না হইলে, তোমার কথা মনে হয় না,— মা বলিয়া তোমায় কেহ ডাকে না! তাই কি মা, ব্যথা দিয়া, দুঃখপারাবারে নিক্ষেপ করিয়া, পরীক্ষা করিতে চাও! মা!—মা!—সন্তানের প্রতি এ কঠোর পরীক্ষা কেন? দেবী!—প্রসন্না হও! বিপদবারিণী!—শরণাগত সন্তানের বিপদ বারণ কর। মা তুমি, জগৎপ্রসূতি তুমি, তুমি বিনা আমাদের আর কেহ নাই। মা!—মা!—একবার এস;—একবার দেখা দেও।

পথ দেখাও!

তুমিই তো মা মায়ায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছ! মহামায়া!—তোমারই মায়ায় মোহিত হইয়া তোমায় ভুলিয়া থাকি! ইন্দ্রজালাদির প্রবর্ত্তিকা তুমিই তো মা! তর্কশাস্ত্রের প্রবর্ত্তিকা তুমিই তো মা! মহামোহময় মমতাগর্ত্তে অনন্ত জগৎকে তুমিই তো ঘূর্ণায়মান করিতেছ মা! আবার জ্ঞানদাত্রী বেদবেদান্তের প্রবর্ত্তিকা তুমিই তো মা! অজ্ঞানান্ধ সন্তান তোমার মহিমা কি বুঝিবে? তাই ভ্রমে পড়িয়া, মায়া-মোহে বিমুগ্ধ হইয়া, বিভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। চলচ্ছক্তি-হীন শিশুর প্রতিপদবিক্ষেপে পদস্খলন ঘটিতে পারে। স্নেহময়ী জননী তাই সর্ব্বদা তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মা গো!—এ অজ্ঞানান্ধ সংসার তোমায় ভুলিয়া বিপথে চলিয়াছে। তুমি যদি তাহাকে পথ না দেখাও, তাহার আর উপায় নাই। সংসার পদস্খলিত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে; তুমি তাহাকে কোলে উঠাইয়া না লইলে, আর কে তাহার উদ্ধার করিবে? তাই মা তোমায় ডাকিতেছি,—হে সর্ব্বেশ্বরি! সকল বাধা-বিঘ্ন দূর কর,—শরণাগত জনের প্রতি প্রসন্না হও। এস মা!—এক বার এস!—এক বার দেখা দেও!—অন্ধ-সন্তানকে পথ দেখাও।

* * *

সর্ব্বস্বরূপিণী!

বৎসরান্তে এক বার আসিয়া, তিন দিন মাত্র থাকিয়া, তমসাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুদ্বিভা বিকাশ করিয়া, কেন মা তুমি চলিয়া যাও? শরতের প্রকৃতি তোমার জন্য ফুল্ল-আসন বিস্তার করিয়া রাখে; শরতের আকাশে নীল চন্দ্রাতপে তারামালা বিখচিত থাকে; স্বচ্ছ-সরোবরে কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়া তোমার চরণকমলে মিশিতে চায়। প্রতি তরু-

শিরে, প্রতি নবমুঞ্জরিত নবীন-পত্রদলে, প্রতি প্রস্ফুটিত পুষ্পরাগে, প্রতি সরোবরের কৃষ্ণকাদম্বিনীতুল্য সুনীলস্বচ্ছ সলিলে, প্রতি নির্ঝরিণীর নবীন বারিধারায়, প্রতি নববিকসিত নলিনীর নবীন নলিনদামে সৌন্দর্য্য-সুষমা বিস্তৃত হয়। তাই কি মা তুমি, অভ্যর্থনার অভিলাষিণী হইয়া, শরতে তিন দিনের জন্য সংসারে শুভাগমন কর? দেশবিশেষের বা রাজ্যবিশেষের অধিপতিই এইরূপ সম্বর্দ্ধনার আকাঙ্ক্ষা করেন। কিন্তু যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী, জলস্থলমরুদ্ব্যোমচরাচর যাঁহার নখাগ্রে পরিচালিত, তাঁহার আবার এ সম্বর্দ্ধনার অভিলাষ কেন? অথবা, তুমি মা কোনরূপ সম্বর্দ্ধনার অভিলাষিণী নও! কিন্তু সংসার জানে না, বুঝে না— তোমার মহিমা; তাই তোমার অভ্যর্থনার আয়োজন করে! কখনও সূর্য্যের খরকরতাপে, রৌদ্রের অগ্নিবর্ষণে, দেশ দগ্ধীভূত হইতেছে! কখনও বর্ষার ভীষণ প্লাবনে জনস্থলী প্লাবিত হইতেছে! কখনও ভূ-কম্পনে বিবিধ নৈসর্গিক দুর্দ্দৈবে সংসার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে! মধ্যে তিন দিনের জন্য জগজ্জননীর সংসারে আবির্ভাব হইবে বলিয়া, প্রকৃতি, কেন তুমি সংসারকে সৌন্দর্য্য-সুষমায় সাজাইতে চাও? পৃথিবীর প্রজা আপন রাজার সমক্ষে শুষ্কহাসি হাসিয়া থাকে বলিয়া, তুমিও কি জগজ্জননীর নিকট প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া, কৃত্রিম ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে চাও? মানুষে ভ্রম শোভা পাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি, তোমার এ ব্যবহার কেন? মা যে সর্ব্বময়ী সর্ব্বস্বরূপিণী!— তিনি কি দেখিতে না পান?—কি বুঝিতে না পারেন?—কি জানিতে না পারেন? তুমি যতই কৃত্রিমতার আবরণ বিস্তার কর না কেন; তোমার অশ্রুধারাপ্লাবিত বিষাদখিন্নবদনে প্রফুল্ল

হাসির যতই স্নিগ্ধলহরী ফুটিয়া উঠুক না কেন;—জগজ্জননী সকলই দেখিতে পাইবেন—সকলই বুঝিতে পারিবেন।

* * *

প্রার্থনা।

মা যদি সকলই জানেন, সকলই বুঝেন; তবে সন্তানের প্রতি এ নিগ্রহ কেন? যদি তিনি জানিতেই পারেন,—দিকে দিকে দিগ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে; যদি তিনি বুঝিতেই পারেন,—দেশব্যাপী ক্রন্দনের মহারোল উঠিয়াছে; তবে তিনি নিশ্চিন্ত নির্ম্মম হইয়া থাকিবেন কেন? অবোধ!—কারণ শুনিতে চাও? যে স্নেহময়ী জননী শরীরের রক্ত দিয়া তোমার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, নিয়ত তোমার প্রতিপালন করিতেছেন, তুমি ভ্রমেও কি কখনও কৃতজ্ঞতার অশ্রু-জলে তাঁহার চরণ অভিষিক্ত করিতে পারিয়াছ?—তুমি ভ্রমেও কি কখনও আকুল-প্রাণে মায়ের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়াছ? মা আসিতেছেন; একবার প্রণত হইয়া প্রাণের ডাকে ডাক দেখি,—

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥

মধুকৈটভবিদ্রাবি বিধাতৃবরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

মহিষাসুর-নির্নাশী বিধাত্রী বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

বন্দিতাঙ্ঘ্রিযুগে দেবি দেবি সৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্ব্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

নতেভ্যঃ সর্ব্বদা ভক্ত্যা চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

স্তুবদ্ভ্যো ভক্তিপূর্ব্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চ্চয়ন্তীহ ভক্তিতঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

বিদেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলং শ্রিয়ং।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তং জনং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।

প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে প্রণতায় মে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্র সংস্তুতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা তথাম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

হিমাচলসুতানাথপূজিতে পরমেশ্বরি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

সুরাসুরশিরোরত্ন-নিঘৃষ্টচরণেঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

ইন্দ্রাণীপতিসদ্ভাবপূজিতে পরমেশ্বরি!
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

দেবি প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড-দৈত্যদর্পবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥"

যিনি বুঝিয়াছেন,—মা আমার সর্ব্বকারণকারণ; যিনি বুঝিয়াছেন,—মা আমার মঙ্গলা, মোক্ষপ্রদা; যিনি বুঝিয়াছেন,—মা আমার কালী, প্রলয়কালে সর্ব্বোদরসাৎকর্ত্রী, যিনি বুঝিয়াছেন,—মা আমার ভদ্রকালী, ভক্তের সুখদাত্রী; যিনি বুঝিয়াছেন,—মা আমার কপালিনী, প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির রক্ষাকর্ত্রী; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি দুর্গা, সর্ব্বদুঃখহরা; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি ক্ষমা, কারুণ্যবতী; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি শিবা, চিৎরূপিণী; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি ধাত্রী, সর্ব্বপ্রপঞ্চধারণকর্ত্রী; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি স্বাহা, দেবপোষিণী; যিনি বুঝিয়াছেন,—তিনি স্বধা, পিতৃপোষিণী; তিনি যখন ডাকিবেন,—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি", মা কি তখন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন? তিনি রূপ পাইবেন, জয়লাভ করিবেন, যশ পাইবেন, শত্রু-সংহারে সমর্থ হইবেন। যখন সংসারে থাকিতে চাহিবেন, তখন তাঁহার রূপে দিক্ আলোকিত হইবে, তাঁহার জয়ধ্বনিতে দিক পরিপূর্ণ রহিবে, তাঁহার

যশোঘোষণায় দিগন্ত মুখরিত হইবে, শত্রুমাত্রেই তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। আবার অন্যপক্ষে এই প্রার্থনার ফলেই তিনি মোক্ষলাভের অধিকারী হইবেন। তিনি যখনই বলিবেন,—'রূপং দেহি ;' জননী তখনই তাঁহাকে পরমাত্মবস্তু প্রদান করিবেন। রূপ আর কি ?—"রূপং রূপাতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাত্মবস্তু।" তিনি যখনই চাহিবেন,—'জয়ং দেহি' ; জননী তখনই তাঁহাকে পরমাত্মের স্বরূপতত্ত্ব অবগত করাইয়া দিবেন। জয় আর কি ?—"জয়ং জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো।" তিনি যখনই চাহিবেন,—'যশো দেহি' ; জননী তখনই তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিবেন। যশ আর কি ?—"সহ নৌ যশঁ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং তত্ত্বজ্ঞানসম্পাদনজন্যং যশস্তদ্দেহি।" তিনি যখনই চাহিবেন,—"দ্বিষো জহি" ; জননী তখনই তাঁহার কামক্রোধাদি শত্রুর সংহার-সাধন করিবেন। দ্বিষ আর কি ?—"দ্বিষো জহি কাম-ক্রোধাদীন শত্রূন্ জহি নাশয়।"

* * *

সাফল্য।

সন্তান যখন মার স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারেন ; স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারিয়া সন্তান যখন কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা জানান,—'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" ; স্বরূপতত্ত্ব অনভিজ্ঞ অভক্ত জন মনে করিতে পারে,—সত্যই বুঝি মার নিকট রূপ চাহিতেছে, জয় চাহিতেছে, যশ চাহিতেছে, শত্রুনাশের ক্ষমতা চাহিতেছে। সে প্রার্থনা যাঁহারা করেন, মার নিকট কেবলমাত্র রূপের জন্য—জয়ের জন্য—যশের জন্য—শত্রুনাশের জন্য প্রার্থনা যাঁহারা জানাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সে প্রার্থনা পূর্ণ হয় বটে ; কিন্তু সে প্রার্থনায়

কেহই চির-আনন্দ চিরসুখ লাভ করিতে সমর্থ হন না। কেবল জগজ্জননীর স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইলে, "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" প্রার্থনার মর্ম্মার্থ অবগত হইলে, প্রার্থনা সার্থক হয়,—পরমানন্দের মোক্ষের অধিকারী হইতে পারা যায়। এই আশ্বিনে শারদ সপ্তমীতে শারদা আসিতেছেন। যিনি জননীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া যিনি মার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহার প্রার্থনা কখনই নিষ্ফল হইবে না। শুভমুহূর্ত্ত একবার আসে। শুভমুহূর্ত্ত আসিয়াছে; একবার প্রাণ ভরিয়া মার চরণে প্রণত হও; একবার ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হও, আর গদগদ কণ্ঠে বল—"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী। দুর্গা ক্ষমা শিবা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥" রূপ বল, জয় বল, যশ বল, শত্রুনাশ বল;—কিছুরই অভাব থাকিবে না।

—— * ——

ক্ষমা প্রার্থনা।

রূপ-কল্পনায়।

কি ভ্রম মানুষের! যিনি বিশ্বরূপ, জগৎ যাঁহার রূপকণা, মানুষ তাঁহারই আবার রূপকল্পনা করে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ শ্বেত-কৃষ্ণ স্থূল-সূক্ষ্ম—কত রূপই না ধ্যানে বর্ণিত?

* * *

স্তুতি-বচনে।

কেবল রূপ-কল্পনা বলিয়া নহে; তাঁহার স্তুতি-বচনও আমরা কত-না নির্দ্দেশ করিয়াছি! যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যাঁহারমহিমা বাক্যের অতীত—বর্ণনার

বহির্ভূত ; তাঁহার সম্বন্ধে কি স্তুতিবচন প্রযুজ্য হইতে পারে? স্তুতি-বচন-বন্ধনে কি তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা যায় ?

* * *

অধিষ্ঠান-স্থানে।

আরও আমাদের কি বিভ্রম! যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহার সে সর্ব্ব-ব্যাপকতা ভুলিয়া আমরা কিনা কেবল তীর্থ-বিশেষে তাঁহার অধিষ্ঠান-কল্পনা করি ? তিনি ওখানে নাই, তিনি সেখানে আছেন, তিনি এদেশে নাই, সে দেশে আছেন,—এ কি বিষম বিভ্রম !

* * *

ক্ষমাভিক্ষা।

ক্ষুদ্র আমরাই কেবল এই বিভ্রম-গ্রস্ত নহি। জগতের বহু মনস্বী মনীষি এই ভ্রমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। লোক-পাবন স্বয়ং ব্যাসদেবকেও এই ভ্রমে পড়িয়া অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। রূপ-কল্পনা, স্তুতিবচন-বিন্যাস এবং অধিষ্ঠান স্থান-নির্দ্দেশ—এই ত্রিবিধ অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব কি কহিতেছেন, দেখুনঃ—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভগবতো
ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যানির্ব্বনীয়তাখিলগুরো-
দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো
যৎ তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদ্বিকলতা
দোষত্রয়ং মৎকৃতং ॥

—— * ——

নিলয়।

অভাবনীয়।

প্রবাহিণীর প্রশান্ত-ক্রোড়ে তরঙ্গের তাণ্ডব-নৃত্য!—কে মনে করিয়াছিল, সে উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস আবার এরূপ শান্তি-সলিলে পরিণত হইবে? অস্থির-জলদের গম্ভীর বজ্র-নির্ঘোষে নভোমণ্ডল বিদীর্ণ হইতেছিল; তখন কে মনে করিতে পারিয়াছিল, আবার সেই আকাশে সুবিমল শশধরের মৃদুহাসি প্রস্ফুটিত হইবে? শ্মশান-সৈকতে প্রাণ-পরিজনের চিতাভস্ম মাখিয়া, কে ভাবিয়াছিল—আবার এই সংসার-প্রহেলিকায় বিভোর হইতে হইবে? চিরবিড়ম্বিত হতাশ-হৃদয়ের সন্তাপ-বহ্নি, কে মনে করিয়াছিল—এমন দ্রবীভূত অশ্রু-নির্ঝরে নির্ব্বাপিত হইবে?

* * *

অন্তরায়।

জীবন-পথে শত অন্তরায়! কোথাও তীক্ষ্ণধার কণ্টকের বিস্তৃত-স্তূপ; কোথাও অভ্রচূড়স্পর্শী গিরি-মালার বিশাল প্রাচীর; কোথাও অনন্ত-প্রসারিত মহাসমুদ্রের বিভীষিকাময় তরঙ্গোচ্ছ্বাস; কোথাও দিগন্ত-প্রসারী, অনল-উদ্গারী মরুভূমির দুরধিগম্য প্রান্তর; কোথাও আবার বনাভ্যন্তরীণ সিংহ-শার্দ্দূলের বিকট হুঙ্কার! জীবন-পথে শত অন্তরায়! আমি কোন্ পথে যাই?

* * *

প্রলোভন।

অন্যদিকে শত প্রলোভন! চঞ্চল নয়ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য্যসুধা অন্বেষণে আত্মহারা! শ্রুতি, বীণা-বিনিন্দিত প্রণয়-মধুর প্রিয়সম্ভাষণ-লাভে আকুলিত! নাসিকা, মনোমদ সুরভি-সুগন্ধের আঘ্রাণ-মানসে উদ্গ্রীব! জিহ্বা, সুমিষ্ট-সুস্নিগ্ধ সুরসাস্বাদনে অগ্রসর! ত্বক, প্রিয়-

স্পর্শলাভে সদা আকুঞ্চিত প্রসারিত! জীবন-পথে শত প্রলোভন! আমি কোন পথে যাই?

* * *

অতৃপ্তি। কত দেখিলাম!—জননী-জঠর পার হইয়া সূতিকা-গৃহে প্রবেশের পর হইতে এ জীবনে কত দেখিলাম! দেখিতে দেখিতে প্রস্ফুটিত-নয়ন আবার মুদিত হইতে চলিল। কৈ আজিও তো দেখার অবসান হইল না!—এ জীবনে আমার দর্শন-পিপাসা মিটিল না তো! আমি নিরুপম নিকুঞ্জকাননের শত-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াছি; আমি প্রকৃতির বিনোদবল্লরী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছি; আমি কামিনীর কমনীয় বদন-সুধাকরের অনিন্দ্য-কান্তি দেখিতে দেখিতে বিমানবিহারী চাতকের ন্যায় আত্মহারা হইয়াছি; সমৃদ্ধের সুধাধবলিত সৌধরাজি, দরিদ্রের শতছিদ্র পর্ণকুটীর, প্রণয়োন্মাদের সযত্নরচিত প্রমোদকানন—আমি কত কত দেখিয়াছি; আবার হিমগিরি-গহ্বরে যোগমগ্ন যোগীর তুষারাচ্ছন্ন শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি—হৃদয়দর্পণে সে মূর্ত্তিও সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! কিন্তু কেন?—কেহ বলিতে পার কি?—আমার দর্শন পিপাসা তবু মিটিল না কেন? আমার শ্রুতি—এ জীবনে তাহাতে কত সুস্বর-সুধা ঢালিয়াছি; মৃদঙ্গ-মন্দিরার মনোমদ মোহন ধ্বনি, বীণা-বেণু-সারঙ্গ-সপ্তস্বরার সমবেত সুস্বর-লহরী—তবকে তবকে স্তূপে স্তূপে কর্ণকুহরে ঢালিয়া দিয়াছি; আবার কলকণ্ঠ কোকিলবধূর কুহরণ-কাকলী, কিম্বা বিহগ-বীণা-বিনিন্দিত বামাকণ্ঠের সুধাস্বরতরঙ্গ—আমার শ্রুতি সে সকল সুখই অনুভব করিয়াছে। তবু কেন?—কেহ

বুঝাইয়া দিতে পার কি?—আমার শ্রবণ-পিপাসা মিটিল না কেন? আসন্ন-শয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—জীবন-নাট্যের যবনিকা-প্রান্তে অন্তর্জলীর পূতক্রোড়ে শায়িত—তারও মনে কেন আশার অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস উছলিয়া উঠে?

* * *

দুই দিক। কোথায় সেই কাল-তরঙ্গের অনন্তপ্রসারী করাল গ্রাস, আর কোথায় এই বিশ্বব্যাপী-ক্রোড়ে ক্ষুদ্র প্রাণীবুদ্বুদ! কোথায় সেই গণনা-গতি-বিনিন্দ্য অনন্তস্থায়ী কাল-গতি, আর কোথায় এই ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের নিমেষসীমান্ত বর্ষকণিকা! কোথায় সেই বহু-যোজনবিস্তৃত সাহারা-মরুভূমির বালুকাস্তূপ, আর কোথায় এই অতি-ক্ষুদ্র বালু-কণাভ্যন্তরীণ মানবের আশা-তৃষ্ণা! একদিকে দিগন্তবিশ্রান্ত অভ্রংস্পর্শী নগরাজের বিপুল ছায়া, অন্যদিকে সূচী-ভেদ্য সামান্য ছিদ্র। একদিকে উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবতের গিরি-গহ্বর উৎপাটন, অন্যদিকে দুর্নিরীক্ষ্য কীটাণুর ক্ষুদ্র আস্ফালন!

* * *

অনন্ত-শক্তি। প্রবলের নিকট দুর্ব্বল পরাভূত! প্রবল, মহাবলের নিকট অবনত! আবার মহাবল, অনন্ত বলের কুক্ষিগত! অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে—একের উপর অন্যের আধিপত্য—প্রবলের উপর মহাবলের আতিশয্য—মহাবল অনন্তবলের অধঃ-গত। কিন্তু কি সে অনন্তবল? সে বল কি—যে বলের আতিশয্যে প্রবল-দুর্ব্বল সকল বলের পরাগতি! বীরদর্প নতশির, পদ-সম্পদ অকিঞ্চিৎকর, কোলাহল-কল্লোলের সাম্যভাব—কি

সে অমূল্য অপূর্ব্ব সামগ্রী—প্রতিযোগিতায় যাহার এত সামর্থ্য প্রদর্শিত!—যাহার সমক্ষে সকল গর্ব্ব খর্ব্ব!

* * *

আদিতে।

সৃষ্টির আদিকালে — চরাচর-স্থাবরজঙ্গমাত্মক ধরয়িত্রীর জন্মসময়ে, একবার মনে কর দেখি, এই বিশ্বের কোন্ মূর্ত্তি ছিল? তখন অন্তরীক্ষে ও ধরণী-পৃষ্ঠে, অনলে ও অনিলে, বাষ্পে ও মেঘে, সলিলে ও কর্দ্দমে, গোলকে ও ভূলোকে—সর্ব্বত্র অভিন্ন—সর্ব্বত্র একত্ব—ব্রহ্মাণ্ড একাকার! তখন, হিমাচল কি ভারতসমুদ্র, সিন্ধুনদ কি ইন্দ্রপ্রস্থ, শিবাজী কি সেকেন্দার—এ জগতে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তখন নরনারী ছিল না, তখন পশুপক্ষী ছিল না, তখন প্রাসাদ-কুটীর ছিল না, তখন আনন্দ-উদ্বেগ ছিল না, তখন বল-বীর্য্য বা ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব ছিল না। ছিল কেবল—মনঃকল্পিত কালরূপী এক অনন্ত আনন্ত্য; আর ছিল—সেই আনন্ত্যের মধ্যে গভীর অতিগভীর নীরবতা। তাহাই জনক, তাহাই জননী; তাহাই প্রকৃতি, তাহাই পুরুষ; তাহাই এই ভূতধাত্রী ধরয়িত্রীর প্রসবিত্রী, তাহাই এই সংসার-সমাজের আদিভূত।

* * *

নীরবতা।

দেখ, এখনও জগতে তদাধিক্য! কত কাল গত হইল—এই পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে, কত যুগযুগান্তর পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ইহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু দেখ—এখনও সে দু'য়ের পূর্ণপ্রতাপ—এখনও তাহাদের প্রবল আধিপত্য। দেখ—নীরবতা—চারিদিক নীরবতাময়—জগৎ এখনও সেই নীরবতা-ক্রোড়ে নিদ্রিত।

তোমার এ ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোলাহল—সে অনন্ত নীরবতা ভঙ্গ করিবে, সাধ্য কি? সে অনন্ত নীরবতার তুলনায়, এ কোলাহল—মহাসাগরে বারিবিন্দু—তাও যেন নয়! শিশু, সহস্র বলশালী হইলেও, জনকজননীর নিকট শিশু বৈ আর কিছুই নয়! কিন্তু সে তুলনায়-পৃথিবী এখন শুক্র-শোনিত! শুক্রশোনিতের সাধ্য কি, জনকের প্রতিযোগী হয়? কাজেই নীরবতায় জগৎ পরিপূর্ণ—পৃথিবী অনন্ত নীরবতাময়। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডও সেই অনন্ততার দিকে প্রধাবিত!

* * *

নীরবে—নিলয়ে।

বৃন্তস্খলিত ফল আপনিই অধঃগামী; উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ইষ্টক, কোন্ অলক্ষ্য আকর্ষণে নিম্নাভিমুখীন্। সে বল তুলনায় অতি সামান্য—যাহা ইষ্টকের উর্দ্ধোত্থান সূচিত করে; সে বৃন্তাধার অতি ক্ষণস্থায়ী—যাহা ফলের শূন্যাবস্থান অবধারণ করে। মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আলোচনায়, এই যুক্তিটি সুন্দর প্রতিপাদিত। ক্ষুদ্র বৃহতের দিকে আকর্ষিত—বড় মহান্ সুন্দর সত্য! ভাব দেখি—কেমন ধীর-নীরবে সে আকর্ষণক্রিয়া পরিসূচিত! নয়নের গোচরীভূত নহে—চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করাও সম্ভবাতীত; কিন্তু কেমন স্থাবর-জঙ্গম কীট-পতঙ্গ জড়-অজড় সর্ব্বত্র তাহা প্রতিফলিত! কে আকর্ষক, কে আকর্ষণ করে, দেখিবার উপায় নাই, বুঝিবার সামর্থ্য নাই, অথচ কেমন নীরবে!—কেমন নীরবে!—কে যেন নীরবতার দিকে সদা আকর্ষণ করে! দৃষ্টির অন্তরালে, ধীরে—অতি ধীরে, কে যেন আপনার অলক্ষ্য বিশাল বাহু বিস্তার করিয়া, নীরবতার ক্রোড়ে টানিয়া

লইতে চায়। তাই দেখি—তরঙ্গিণীর উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস শান্তি-সলিলে পরিণত! তাই দেখি—জীবক্রীড়া সলিল-পৃষ্ঠে বুদ্বুদের নৃত্যমাত্র! কাল—কালসাগরে—নীরব—নীরবতার দিকে—বিশ্ব বিলীন হইতে চলিয়াছে। নিলয়—নিলয়ন জগতের প্রাকৃতিক বিধান।

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা।

প্রেম-ধর্ম্ম।

পুণ্যধাম নবদ্বীপে, শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে, প্রেম-ভক্তির পবিত্র প্রস্রবণ উত্থিত হইয়াছিল। কলুষ-নিরয়-নিমগ্ন কলির পাতকী, হরিনামের অমৃত-অভিষেকে, অমরার পথ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। বঙ্গভূমি—মা আমার, সুসন্তানের স্নেহালিঙ্গনে, অন্ততঃ অল্প দিনের জন্যও শান্তি-সুখে সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু কি অভিশাপ বিধির—বিকৃতির বিষম বিপাকে, পরক্ষণেই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিমজ্জিত হইল। মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্রের প্রস্ফুট আলোক বিতরণ করিয়া, জগন্নাথে লীন হইলেন; অমনি অমার আঁধার সংসার ঘেরিয়া ফেলিল।

* *

বিকৃতি-বিপাক।

শ্রীচৈতন্যের পরম ধর্ম্ম, বিকৃত অপধর্ম্মে পরিণত হইল। যে নাম-সুধা, প্রাণ ভরিয়া, তিনি আচণ্ডাল সর্ব্বজনে দান করিয়া গেলেন; কলির জীব, ভ্রান্তি-বশে, তাহা মোহ-পঙ্কে প্রোথিত করিল। যে বীজ-মন্ত্র, তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে বপন করিয়া গেলেন, সকলই কুবুদ্ধি-জঞ্জালে আচ্ছন্ন হইল। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা, শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম—কালবশে বিকৃত বিধর্ম্মে পরিণত হইয়া আসিল। তিনি স্বয়ং যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করিলেন, আপনি যাহা মস্তকের মণি-স্বরূপ মান্য করিয়া গ্রহণ

করিলেন, অভিন্নহৃদয় আপন শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরাকে যাহার অনুবর্ত্তী করিলেন; আজি কিনা মানুষ, তাহা উপেক্ষা করিয়া—তদ্বিপরীত পথে পরিচালিত হইয়া, গৌর-শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ নয়! শুধু আপনারা বলিয়া নহে—অপরকেও আবার স্বীয় ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে চায়!

* * *

প্রামাণ্য কথা।

এই কি সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—শ্রীচৈতন্যমুখপঙ্কজ-বিনিসৃত? এই কি সেই গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম—তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্যপ্রশিষ্য-পরিচালিত? শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহে শ্রীগৌরাঙ্গের-ধর্ম্ম সম্যক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কি শিক্ষা পাওয়া যায়? অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীগৌরাঙ্গের সম-সাময়িক সহচর। তৎপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল-শাস্ত্র। উক্ত গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে, গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের সার সত্য প্রকটিত। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, আপনার প্রধান ভক্ত রামানন্দ রায়ের হৃদয়ে প্রকট হইয়া, ভক্তমুখে ধর্ম্মমাহাত্ম্য যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার, উক্ত প্রসঙ্গের প্রারম্ভেই, রামানন্দে শ্রীচৈতন্যাবির্ভাব-বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে কহিতেছেন,—

"সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈস্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রযাতি॥"

অর্থাৎ—'গৌর-জলনিধি, রামানন্দ রায় নামক ভক্ত-মেঘে স্বকীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত-সুধা সঞ্চারিত করিয়া, সেই ভক্তমেঘপ্রদত্ত ভক্তি-

সিদ্ধান্ত-সমূহ গ্রহণপূর্ব্বক, ভক্তি-রত্নাকর নাম ধারণ করিতেছেন। ইহাই তো মর্ম্ম কথা।

* *

সার সত্য।

বারিনিধি, বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া, মেঘরূপে পরিণত হয়; মেঘ পুনরায় বৃষ্টি-আকারে, সমুদ্রেই পতিত হয়; শুভনক্ষত্রে শুক্তি-গর্ভে বৃষ্টি-পতনে, রত্ন-সঞ্চয় সম্ভবনা; সমুদ্রের রত্নাকর নাম,—সেই উপলক্ষে। সমুদ্র যেমন আপন জল বাষ্পকারে পরিণত করিয়া, শুভসুযোগে আপনাতেই রত্ন-সঞ্চয় করাইয়া লন; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তদ্রূপ, পরম ভক্ত রামানন্দ রায়কে আপন জ্ঞানে জ্ঞানী করিয়া, তন্মুখনিঃসৃত এই অমূল্য জ্ঞান-রত্ন গ্রহণ করিতেছেন;—

"প্রভু কহে 'কোন বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার ?'
রায় কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥"

'কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?'
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি ॥'

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?'
'রাধাকৃষ্ণের প্রেম যার সেই বড় ধনী ॥'

'দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর ?'
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর ॥'

'মুক্ত-মধ্যে কোন্ জনে মুক্তি করি মানি ?'
'কৃষ্ণ প্রেম যার সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥'

'গান-মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম ?'
'রাধাকৃষ্ণের প্রেম-কেলি যেই গীতের মর্ম্ম ॥'

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার ?'
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥'

'কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?'
'কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ ॥'

'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?'
'রাধা-কৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান ॥'

'সব তেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?'
'শ্রীবৃন্দাবন-ভূমি, যাঁহা লীলা রাস ॥'

'শ্রবণ-মধ্যে জীবের কি শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?'
'রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥'

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?'
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম ॥'

'মুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি ?'
'স্থাবর-দেহ দেব-দেহ যৈছে হয় স্থিতি ॥'

'অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে।'
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥

অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥"

ভক্তিতেই মুক্তি অধিগত, ভক্তের কাছেই ভগবান বাঁধা,—শ্রীচৈতন্য-ধর্ম্মের মূল এই। কিন্তু কি ক্ষোভ, সে আসল শিক্ষা ভুলিয়া গিয়া, মানুষ এখন বিপরীত শিক্ষা লাভ করিতে বসিয়াছে! ধ্যানে জ্ঞানে মনে, ভাবে কর্ম্মে চিন্তায়, ভগবান ভিন্ন যিনি অন্য কিছু জানেন না—তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক, তাঁহারই জীবন সার্থক,—শ্রীচৈতন্যের ইহাই সার শিক্ষা।

নাম-কীর্ত্তন।

আলোক।

স্বর্গ হইতে একটা আলোক-রেখা, মধ্যে মধ্যে মর্ত্ত্যে নামিয়া আসে। ঘোর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়, সে আলোকে ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয়; নির্ব্বাপিত দেউটি, রশ্মি-সংযুক্ত প্রজ্বলিত হয়। সে সুযোগ—একবার আসে। সেই তরিয়া যায়—যে হেলায় না হারায়! সেই ধন্য হয়—যে নির্ব্বাপিত দীপ জ্বালিয়া লইতে পারে! ক্বচিৎ কখনও সেই সুযোগ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মের পবিত্র আলোক-রশ্মি ক্বচিৎ কখনও অন্তরে অন্তরে স্থান পায়। সে আলোক, বিদ্যুৎ-বিকাশে অবসিত না হয়; সে আলোকে, প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়া লইতে পারি; চির-অন্ধহৃদয়, সে আলোকে চির-জ্যোতিষ্মান হয়;— এ আকাঙ্ক্ষা, কেন না আসে?

* * *

ধর্ম্মের ভাণও।

ধর্ম্মের ভাণও ভাল—যদি স্থায়ী হয়। ধর্ম্মের নামও ভাল—যদি সম্পদে-আপদে সর্ব্বকালে স্মরণ থাকে। ধর্ম্মের আবরণও ভাল—যদি অধর্ম্মের অসৎ-সঙ্কল্প-সাধনে পর্য্যবসিত না হয়! সাধনার অনুষ্ঠান এই—ধর্ম্মরাজ্য-প্রবেশের প্রথম পথ এই! আগে বাহ্য, পরে অন্তর; আগে বহিরঙ্গ, পরে অন্তরঙ্গ। বহিঃপ্রকৃতি বিশুদ্ধ হইতে হইতেই তো অন্তঃপ্রকৃতি পরিশুদ্ধ হয়! ব্রহ্মচর্য্য বাণপ্রস্থ সর্ব্বপথেই এই পদ্ধতি। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, অগ্রে জটাবল্কল ধারণ করে; পশ্চাৎ ইষ্টারাধনায় নিযুক্ত হয়। ইষ্ট-প্রাপ্তি—দূরে অতি-দূরে পুরোভাগে অবস্থিত থাকে। বালক, বিদ্যামন্দিরে যায়, পুস্তকের রাশি বহন করিয়া বেড়ায়; সেও

বিদ্যালাভের পূর্ব্ব হইতে। অভ্যাস আগে চাই, ভাণ পূর্ব্বাহ্নে প্রয়োজন, আদর্শ আলেখ্য-পটে আলম্বিত; তবে তো তার পূর্ণ-পরিণতি পাইবে! তাই বলিতেছিলাম—আগে দেহশুদ্ধি-বহিঃ-শুচি, পশ্চাৎ চিত্তশুদ্ধি-মনঃস্থৈর্য্য। ভাণ করিতে করিতেই, ভাব আপনি আসিতে পারে; ডাকিতে ডাকিতেই নামের-সুধা কর্ণে রচিত হইতে থাকে।

বাহ্যদৃশ্য। সেই জন্যই নাম-কীর্ত্তন প্রয়োজন। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের বাহ্য আন্দোলনে, হৃদয় উদ্বেলিত হয়। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতে করিতেই, ধর্ম্ম স্থায়ী হইতে পারে। 'হরি হরি' ডাকিতে ডাকিতেই, হরি হৃদয়ে আসিয়া থাকেন। ধ্রুব প্রভৃতির সরল ধ্যান-ধারণায় তো বটেই; রাজ্যৈশ্বর্য্যের কামনায় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্বর্গ সিদ্ধিলাভ—সে সাধনায় সম্ভবপর তো বটেই! অধিকন্তু, অতি পাষণ্ড দস্যু যে—সেও, রাজভবনে দস্যুবৃত্তি করিতে গিয়া, অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজ-কন্যা-লাভের অন্ধ আশায় মুগ্ধ হইয়া, নৈমিষারণ্যে সাধুসঙ্গে সদাচারের ভাণ করিতে বসিয়া, সংসারে আর ফিরিতে পারিল না—অর্দ্ধেক রাজত্বের প্রলোভনেও না, রাজকন্যার রূপমোহেও না! দৃষ্টান্ত—সংসারের প্রতি দৃশ্যপটে পরিদৃশ্যমান। সাত্ত্বিক বসন, সাত্ত্বিক অশন—সত্ত্বভাবের পরিপোষক; রাজসিক বেশ, রাজসিক আহার—রজোভাবের পরিবর্দ্ধক; তামসিক খাদ্য-ভূষণ—তমোভাবের প্রকৃষ্ট পোষণ। এ তো বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত! এ তো জাতিধর্ম্মের বিভেদ-ক্রমেও বিশদীকৃত!

পূর্ণচিদানন্দ।

স্থূলতঃ বহির্দর্শন প্রয়োজন হইলেও, মূল লক্ষ্য অন্তরস্থ হওয়া আবশ্যক। মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বলিলে, কেহ হয় তো সিদ্ধির সঙ্কুলান করিয়া দিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে সিদ্ধির মাদকতা জন্মায় কি? সিদ্ধি বাটিয়া লইয়া গায়ে মাখিলে, ব্যক্তিবিশেষের না হয় একটু নেশার সঞ্চার হইতে পারে। কিন্তু পূর্ণ উন্মাদকতার জন্য, সিদ্ধি পান করিতে হয়। ভজন-সাধন সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ ভাব। নাম ধরিয়া চীৎকার করিতে করিতে, দূরে তাঁর ছায়াদর্শন অসম্ভব নহে; তাঁহাকে আরও একটু নিকটস্থ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলে, অল্প একটু আনন্দ-লাভও সম্ভবপর; কিন্তু পূর্ণরূপে অন্তরস্থ করিতে পারিলে, সচ্চিদানন্দের আবির্ভাবে, তখন পূর্ণচিদানন্দ লাভ হয়। ভবিষ্যতের সেই পূর্ণচিদানন্দ-লাভ-কল্পনায়—সহস্রের মধ্যে এক জনেরও সেই ভাবাবেশ-কামনায়—কোটী জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে একজনেরও উত্তরণ-আশায় নামগানের সার্থকতা। শাস্ত্রে আছে,—"কলিযুগে নাম-সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বার্থপ্রদ। সংসারবিচরণশীল মনুষ্যের পক্ষে, এতাধিক পরম লাভ আর কিছুতেই নাই। কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তন-মাত্রেই পরম শান্তিলাভ ও সংসার-ক্লেশ বিনষ্ট হয়।" যে সঙ্কীর্ত্তনের এত মাহাত্ম্য, যে সঙ্কীর্ত্তন পরিণামে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ; সে সঙ্কীর্ত্তন কিসে স্থায়ী হয়, সে সঙ্কীর্ত্তন কিসে হৃদয়ে হৃদয়ে স্থান পায়, সে সঙ্কীর্ত্তন কিসে পূর্ণচিদানন্দ প্রদান করে; সে ভাবনা, একবার ভাবিবে না কি ভাই!

পুণ্যপথ।

পৃথিবীর ধ্বংস।

এই পৃথিবীর নাকি ধ্বংস হইবে! এই সোনার সংসার নাকি রসাতলে যাইবে! এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নাকি প্রলয়পয়োধিজলে পুনরায় ভাসমান হইবে! জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের গণনায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে—সপ্তগ্রহের সমাবেশ ঘটিলে, এই পৃথিবীর ধ্বংসকাল উপস্থিত হইবে! কথিত আছে—দ্বাপর-কলির সংযোগ-সময়ে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে এইরূপ সপ্তগ্রহের সম্মিলন সূচিত হইয়াছিল। সেদিন ভারতের কি বিষম দিনই গিয়াছে! সেদিন অসংখ্য অগণ্য নরমুণ্ডে রণচামুণ্ডার কি ভীষণ পূজাই সমাহিত হইয়া গিয়াছে! সেদিন নর-শোণিত-স্রোতের প্রবল প্রবাহে কি বিকট স্রোতস্বিনীর উদ্ভব হইয়া কত শত সুবর্ণক্ষেত্র প্লাবিত করিয়াছে! হায়!—সে কি দুর্দ্দিনই গিয়াছে—ভারতের শৌর্য্য-প্রতিম গৌরব-রবি আর্য্যসুতগণ যেদিন সেই মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!

* * *

নিগ্রহের একশেষ।

দৈব-নিগ্রহের আর বাকি কি? বিগত কয়েক বৎসর হইতে দৈবনিগ্রহের উপর যে দৈবনিগ্রহ আসিয়া ভারতের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে নিগ্রহের আর বাকী কি? কুরুক্ষেত্র-সমরে সপ্তগ্রহ-সংযোগে এককালে অসংখ্য লোকক্ষয় সাধিত হইয়াছিল। সে, সময়-বিশেষের সাময়িক গ্রহ-বৈগুণ্যের ফল মাত্র। আজি মহামারী, কালি দুর্ভিক্ষ, পরশ্ব জলপ্লাবন,—নিত্য নূতন অভিনব নিগ্রহ বিদ্যমান। ইহার উপর কি অধিকতর গ্রহবিপর্য্যয় হইতে পারে? সকল বিপদই ভারতবাসীর

অস্থিমজ্জার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। সহিয়া সহিয়া, অভ্যস্থ হইয়া, কোনও বিপদই আলিঙ্গন করিতে ভারতবাসী আর পরাঙ্মুখ নহে। ভাবী গ্রহবিপ্লবের বিভীষিকার কথায়, ভারতবাসী তাই আর তত বিচলিত নহে। আসে—আসুক মহাপ্রলয়; হয়—হউক ব্রহ্মাণ্ডের লয়; ভারতবাসী প্রস্তুত আছে—শুভাশুভজ্ঞানশূন্য উদাসীনভাবে বক্ষ পাতিয়া আছে। মোহের অবস্থায়, বিকারের বিভ্রমে, কর্ম্মের বিপাকে, মানুষের যাহা হইয়া থাকে, অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে, ভারতের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিতে বসিয়াছে। আমরা উদাসীন—কর্ম্মময় সংসারক্ষেত্রেও কর্ম্মহীন। আমাদের উপায় আছে কি?

* * *

সকলই কর্ম্মফল।

কর্ম্মের ফল নয় তো আর কি বলিব? কর্ম্মবৈগুণ্যেই গ্রহবিপ্লবের সূচনা হয়। আধি-ব্যাধি-শোক-তাপের মধ্যে ভারতবাসী নিয়ত জর্জ্জরিত! কর্ম্মবৈগুণ্যই কি তাহার কারণ নহে? এই সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভারতভূমি দুর্ভিক্ষের দাবদাহে দগ্ধীভূত হয়—সে কি অভাগাদের কর্ম্মফলে নহে? এই গঙ্গা-যমুনা-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরীর সুধাধৌত ভারতবর্ষে মহামারী উপস্থিত হয়—সেও কি অভাগাদিগের কর্ম্মবৈগুণ্যে নহে? পৃথিবীর যদি অবসান হয়, এই সোনার সংসার যদি রসাতলে গমন করে, সেও বলিব—অভাগাদিগের কর্ম্মফলে! ভারতের দুর্ভিক্ষ মহামারীর সংহার-মূর্ত্তি দেখাইয়া, অথবা ইউরোপ মহাসমরেরকথা উল্লেখ করিয়া, জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পৃথিবীর ভাবী পরিণামের যে অশুভ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহাও কর্ম্মফলদ্যোতক। রাজার বিপদ, প্রজার বিপদ, স্বদেশের

বিপদ, বিদেশের বিপদ,—সকলই কর্ম্মফলের নিদর্শন-স্থানীয়। যে ইউরোপীয় মহাসমরে কুরুক্ষেত্র-সমরের লোকক্ষয় সূচিত হইতেছে, উহা কর্ম্মফল-ভোগ মাত্র।

* * *

কর্ম্মে মতিমান্।

কর্ম্মভূমি ভারত-ভূমি, কর্ম্মের-আদর্শ ভূমি ছিল। ভারতের সুখৈশ্বর্য্যের যে অতীত চিত্র-পট নয়ন-সমক্ষে নিত্য-দেদীপ্যমান, সকলই কৃতকর্ম্মের পরিচায়ক। ভারতে যে অমরার সুখ-সমৃদ্ধি ছিল, এই বনস্থলী যে নন্দনের পারিজাত-হারে শোভাময়ী ছিল—সকলই কর্ম্মের মাহাত্ম্যে! সেই কর্ম্ম আমরা বিস্মৃত হইয়াছি; সেই কর্ম্ম হেলায় হারাইয়াছি; আর সেই কর্ম্মের অভাবে আজি আমরা নরকের হাহাকারে রোদন করিতে বসিয়াছি! সেদিন কি আনন্দের দিন গিয়াছে—যেদিন বেদ-বেদান্তের ব্রহ্মনির্ঘোষে ভারতাকাশ পরিপূরিত ছিল! সেদিন কি আনন্দের দিন গিয়াছে—যেদিন ভারতের পবিত্র যজ্ঞ-ধূমে গগনমণ্ডলে সুধার নির্ঝর প্রবাহিত হইয়াছিল! সেদিন কি সুখ-শান্তির পবিত্র হিল্লোল প্রবাহিত হইয়াছিল—যেদিন ভারতের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চতুর্ব্বর্ণ, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া, কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন। হায় সেদিন! আর কি সেদিন আসিবে? আর কি কখনও ভারতসন্তান—আর্য্যসন্তান—সেই শুভ শান্তিপ্রদ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইবেন? মহা-প্রলয়-ভয় এখনই অপসৃত হইতে পারে, সপ্তগ্রহ-সমাবেশ এখনই শুভফলপ্রদ হইতে পারে, জ্যোতির্ব্বিদের গণনা এখনই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতে পারে; ভাই হিন্দু!—

তুমি এখনও যদি কর্ম্মানুষ্ঠানী হও! যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, দান-ধর্ম্মে রত হও, ভগবৎমহিমা কীর্ত্তনে কালক্ষেপ কর; দেখিবে,—প্রলয় তোমার নখাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না। তুমি একা আছ, তুমি একাই ধর্ম্মানুষ্ঠান কর; তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবে! তোমরা দশ জনে একত্র মিলিয়াছ; তোমরা দশ জনেই কর্ম্মপর হও; দশজনেই সুফল দেখিতে পাইবে। একের পাপে যেমন দশের বিনাশ সাধিত হয়, তেমনই একের পুণ্যে দশের রক্ষাও সম্ভবপর। জগতে এখনও দুই একজন পুণ্যাত্মা আছেন বলিয়া, সহস্রের মধ্যে এখনও দুই এক জনও ধর্ম্মাত্মার স্থান আছে বলিয়া, জগৎ এখনও বিদ্যমান আছে। জগতে যত দিন এক জনও ধর্ম্মাত্মা পুণ্যাত্মা বিরাজ করিবেন, তত দিন কোনই ভয় নাই—পৃথিবী ধ্বংস হইবার কোনই আশঙ্কা নাই। যদি আত্মরক্ষা দেশরক্ষা করিতে চাও, পুণ্যপথে চলিয়া পুণ্যাত্মা হইবার চেষ্টা কর।

—— * ——

নরদেবতা।

মানুষ কি?

এই মানুষই কি দেবতা হয়? এই মানুষই কি স্বর্গের সিংহাসন লাভ করে? এই মানুষই কি দয়া-শ্রদ্ধা-ভক্তির মূর্ত্তিমতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়? নর-দেহের দেব পরিণতি, নিরয়-কীটের স্বর্গপ্রাপ্তি, রাক্ষসের অমরত্ব-লাভ— কেহ বলিতে পার কি—কিসে হয়? সংসারের দিকে যখন চাহিয়া দেখি—নিগূঢ় অন্তঃস্থলের দিকে যখন একান্তে লক্ষ্য করি—অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যখন তীক্ষ্ণদৃষ্টি সঞ্চালন

করি—তখন কি দেখিতে পাই? মানুষ!—সে কি মানুষ? সে যে পশু হইতেও অধম! দেখিতে পাই—মানুষে প্রেত-পিশাচের বিকট দৃশ্য! দেখিতে পাই—মানুষের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে পাশব-প্রবৃত্তি প্রবহমান! দেখিতে পাই—নরকের কীট, সেও বরং পদে আছে; কিন্তু মানুষ—তদপেক্ষাও অধম!

* * *

কিরূপে সম্ভবপর?

কিন্তু সেই মানুষ—সেই আবার দেবতা হয়! সেই মানুষ—সেই আবার স্বর্গের সিংহাসন লাভ করে! অদ্ভুত—আশ্চর্য্য এ সমস্যা! অথচ ইহা স্বতঃসিদ্ধ; নিত্য- প্রত্যক্ষীভূত সত্য। স্বর্গীয় সে অনুপম দৃশ্য, নয়ন-সমক্ষে নিত্য-প্রতিভাত না দেখিলেও কল্পনা-কথা বলিয়া উড়াইবার নয়। বরং সাধারণ দৃষ্টির অদৃষ্ট, আমাদের স্থূল চক্ষুর অগোচর, এই পর্য্যন্তই বলা চলে। নচেৎ, হয় না—মানুষের দেব-পরিণতি অসম্ভব—এ কথা বলিবার সাধ্য কি? সংসারেই—কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধার্ম্মিক, কেহ অধার্ম্মিক,—নানা শ্রেণীর নানা-অবস্থার লোক আছে। কেহ বা সুখশান্তির সুবিমল মধুরতায় পরিমগ্ন, কেহ বা দুঃখ-দুর্ব্বিপদের চরম অবস্থায় উপনীত! ইহাতেই বুঝা যায়—স্বর্গীয় সেই মধুর দৃশ্যের অন্ততঃ একটা প্রতিবিম্বও পাওয়া যায়—মানুষের উচ্চ-পরিণতি কিদৃশ সম্ভবপর! অর্থাৎ, এই দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ এই ধরায় মানুষই যে অমরার পূর্ণ সুখশান্তি পাইতে পারে—সংসারের নিত্য-প্রত্যক্ষীভূত দৃশ্যেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

* * *

উপরে দৃষ্টি চাই।

উপরে একজন আছেন। সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বকালে মানুষের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, উপরে এক জন আছেন। মানুষ সর্ব্বদা বিস্মৃত হয়, সদসৎ সকল কার্য্যে ভুলিয়া যায়—উপরে সেই একজন আছেন! আমার জন্মগ্রহণের কত পূর্ব্ব হইতে আমার আহার-পুষ্টির সংস্থাপন-স্বরূপ জননীর স্তন্যাধারে যিনি ক্ষীরধারা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া দেন, আমি বিপথে বিভ্রান্ত অবস্থায় পাছে বিপদস্থ হই—আশঙ্কায়, বিবেক-রূপে সর্ব্বদা যিনি আমার পথ-প্রদর্শন করেন; এমন হয়—এমনই অকৃতজ্ঞ মানুষ হইতে পারে যে, দণ্ডে দণ্ডে তাঁহাকেই ভুলিয়া যায়! ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সুপথ পরিত্যাগ করিয়া, বিপথে বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া মারা যায়। সংসারেই যে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ সু, কেহ কু—বিবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহারও কারণ—স্মৃতি-বিস্মৃতি। যাঁহার হৃদয়-মধ্যে সর্ব্বকার্য্যে সেই মহিমাময়ের স্মৃতি উদিত থাকে, তিনিই সুখী, তিনিই ধন্য। আর যিনি তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়াছেন, সংসারে প্রবেশের পরই আপন পরিপালক পিতার কথা প্রতিপদে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার আর কি গতি সম্ভবে? সংসারে যে ঘোর যন্ত্রণার ছবি, সে ছবি—তাঁহারই নহে কি? এ যে প্রাণের কথা—সার সত্যতত্ত্ব। হৃদয়ে হাত দিয়া দেখ—এ সত্য ছত্রে ছত্রে মিলিবে।

* * *

পরীক্ষণীয়।

আরও মিলিতে পারে—যদি আরও একটু অগ্রসর হইতে পার। এই যে তুমি নিত্য যম-যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছ, এই যে তুমি সংসার-মধ্যেও নরক-কীটের তীব্র দংশন-জ্বালা সহ্য করিতেছ; তুমিও ভাই,

এখনই প্রমাণ হাতে হাতে পাইতে পার। এখনও যিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটে যাইবার চেষ্টা করুন; যিনি নিকটে আছেন, তিনি অতি নিকটে যাইবার চেষ্টা করুন; যিনি অতি নিকটে আছেন, তিনি মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করুন। সার উপদেশ এই মাত্র। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—উপরে একজন আছেন। এই বুঝিয়া মানুষ যদি কর্ম্ম করিতে পারে, তবে আর তাহার ভয় কি—ভাবনা কিসের? তবেই এই মানুষ দেবত্ব-লাভে অধিকারী হইতে পারে।

—— * ——

মাতৃনাম।

মা-নাম।

মা-নামে, না জানি, কি সুধা সঞ্চিত আছে! ক্ষুদ্রশিশু, মা-নামে শান্তি পায়; প্রৌঢ়ের পরিতপ্ত প্রাণেও, মা-নামে শান্তিধারা বর্ষণ করে; বৃদ্ধের আসন্ন-মৃত্যু-শয্যাশায়ী প্রাণ—সেও যেন মা-নামে নবজীবন প্রাপ্ত হয়! বিপদের বিষম বিভীষিকা, বদন ব্যাদান করিয়া, যখন গ্রাস করিতে আসে; মা-নামের মোহ-মন্ত্রে, সে তখন স্তম্ভিত হইয়া ফিরিয়া যায়! মা-নামে বিপদ দূরে পলায়ন করে; আধি-ব্যাধি-শোক-তাপ নরদেহ স্পর্শ করিতে পারে না! তবে যে মানুষ বিপদ-জালে বিজড়িত হয়, তবে যে প্রাণী প্রাণ লইয়া ব্যাকুল হয়, সে কেবল—মা-নাম বিস্মৃত হইয়া। মা বলিয়া ডাকিতে পারিলে, ডাকার মত ডাকিতে জানিলে, মা কি কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? অভাগা আমরা, মাকে ভুলিয়া থাকি; ভ্রমেও একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। মা আমাদের আসিবেন কেন?

মা কি স্থির ?

কিন্তু না আসিয়াও তো মা থাকিতে পারেন না! জননীর অভিমান কতক্ষণ থাকিতে পারে? আমরা সহস্র বার তাঁহাকে বিস্মৃত হই, আমরা কোটী বার তাঁহাকে উপেক্ষা করি; কিন্তু মার প্রাণ, সন্তানের বিপদে, কখনই স্থির থাকিতে পারে না। সন্তানের হাহাকার, আর্ত্তের আকুলতা, মা যেন আপনা-আপনি কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করেন। তাই বুঝি মা, আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; প্রাবৃটের রোদন দেখিয়া, ধরণী অশ্রু-প্লাবিত দেখিয়া, সংসারের আর্ত্তনাদ শুনিয়া, গৃহে গৃহে প্রবল পীড়ার হাহাকারে ব্যথিত হইয়া, মা বুঝি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। আমাদের এত উপেক্ষার পরও, তিনি আপনা-আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবার শান্তি প্রদান করিতে আসিতেছেন।

* * *

মা আসিতেছেন।

মা যে আসিতেছেন, শরতের শুভ্রাকাশে, ঐ দেখ, তাঁহার দিব্যজ্যোতি বিকশিত হইতেছে! মা যে আসিতেছেন, ঐ দেখ প্রস্ফুট শতদলে তাঁহার চরণ-রাগ প্রকটিত হইয়াছে! মা যে আসিতেছেন, ঐ দেখ, নবীন-বল্লরী নবসাজে নব-রাগে আবেগ-ভরে আহ্বান করিতেছে! কোন্ দিকে—স্থাবর-জঙ্গম পশুপক্ষী—কে বল, মার আগমন প্রত্যক্ষ না করিতেছে? অন্ধ আমরা, বিস্মৃতি-বিভ্রমগ্রস্ত আমরা, মার আগমন দর্শন করিতে পারিতেছি না। পতত্রী, পত্রশিরে বসিয়া, 'মা মা' বলিয়া আহ্বান করিতেছে। প্রকৃতি, প্রফুল্লমনে পুষ্প-সম্ভার সাজাইয়া রাখিতেছে। জলস্থল-মরুদ্ব্যোম বিশ্ব-চরাচরে মায়ের আগমন সূচিত হইতেছে। আমরা দেখিয়াও

দেখিতে পাইতেছি না। মা দয়া করিয়া আসিতেছেন, মা সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় দিতে আসিতেছেন, সন্তানের কাতরতা সহ্য করিতে না পারিয়া আপনা-আপনি সেই কাতরতা দূর করিতে আসিতেছেন। এখনও কি আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য? কেবল বিপদ বিপদ করিয়া ব্যাকুলতা বাড়াইলে, বিপদের অবসান হয় কি? মা আসিতেছেন—বিপদবারিণী, তিনিই বিপদ দূর করিবেন। এস, আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই। আশ্বিনে অম্বিকা আসিতেছেন। ভয় কি—ভাবনা কি—তিনিই বিপদ দূর করিবেন? এস, এখনও আমরা তাঁহার শরণাগত হই। মা মা!—কাতরকণ্ঠে ডাকিতেছি—মা মা!—একবার এ কাঙ্গালের গৃহে আয় মা! মা গো!—তোর আগমনে আমার এ শ্মশান-গৃহ একবার স্বর্গের নন্দনে পরিণত হউক। মা মা!—আয় মা!

আত্মোৎসর্গে।

দুর্ব্বিপদে প্রাণপণ।

পাপ হইতেই দেব-রোষের সৃষ্টি। দেব-রোষ হইতেই দুর্ব্বিপদের সূচনা। প্রাচীন কালের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ তাহা বুঝিতেন। দেশে কোনও দুর্ব্বিপদের আবির্ভাব হইলে, দেব-রোষের শান্তির জন্য, তাঁহারা প্রাণান্ত পণ করিতেন। তাহাতেই দেশের মঙ্গল হইত।

* * *

ইতিহাসে দৃষ্টান্ত।

প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বে, কাশ্মীর-রাজ্যে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। দুর্ভিক্ষ নিবারণে দেব-রোষ-শান্তির জন্য কিরূপে প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়—তাহারই

একটি উজ্জ্বল উদাহরণ তৎকালে প্রদর্শিত হয়। কাশ্মীরে দুর্ভিক্ষ যখন প্রবল হইল, রাজা অকাতরে ধন-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ভাণ্ডার শূন্য হইল; তথাপি দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইল না। অভুক্তের আর্ত্তনাদে রাজ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

* * *

রাজার আত্মোৎসর্গ।

রাজা, ব্যথিত হৃদয়ে, একদা রাজ্ঞীকে কহিলেন,—"নিশ্চয়ই আমাদিগের কোনও পাপে এই দারুণ দুর্ব্বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। যে দেশ শস্যসম্ভারে সতত পরিপূর্ণ থাকিত, সে দেশে কেন এমন দুর্ভিক্ষ হইল? প্রজা নিরীহ, পাপী আমি। শত চেষ্টা করিয়াও প্রজাগণকে আমি এ বিপদে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তবে আমার এ পাপ প্রাণে আর প্রয়োজন কি? দেবতার সমক্ষে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে এ দেহ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃ। প্রজার এ অনাহার মৃত্যু,-আর আমি সহিতে পারি না।" রাজা দেহ উৎসর্গে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

* * *

সুফল-প্রাপ্তি।

চিতা-অগ্নি প্রজ্বলিত হইল। রাজা প্রাণদানে প্রস্তুত হইলেন। সে আত্মোৎসর্গের পবিত্র অনুষ্ঠান কখনও নিষ্ফল হয় কি? দেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। দেশে শান্তিবারি: বর্ষণ হইল। রাজা অন্তরীক্ষে দৈববাণী শুনিলেন—"বৎস! ক্ষান্ত হও। তোমার আন্তরিকতায় দেশের দুর্ব্বিপদ অচিরেই দূরীভূত হইবে।" রাজা আশ্বস্ত হইলেন। ক্রমশঃ প্রজার হাহাকার নিবারিত হইল। শান্তির স্নিগ্ধ হিল্লোল দেশে পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

—— * ——

নাদ।

বিরাট্ ধ্বনি।

বসুন্ধরা শব্দময়ী। যত কাল হইতে বসুন্ধরার সৃষ্টি হইয়াছে, তত কাল হইতে, কালের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, শব্দকোলাহল-সম্মিলিত একটা বিরাট কম্পিত ধ্বনি উর্দ্ধে মিশিয়া যাইতেছে। কালও অনন্ত, সে শব্দও অনন্ত।

* * *

মহাধ্বনি।

মহাবল দশানন, কত কাল হইল অনন্তে বিলীন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চিতাগ্নির শব্দ, ভারতবাসী এখনও শুনিতে পায়। সে শব্দ, কালবক্ষে চিরকাল বিরাজিত। তাহা যে কত অনন্ত কাল স্থায়ী হইবে, তাহা জানি না। কত ধ্বনির সম্মিলনে কালের এই মহা-ধ্বনির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে?

* * *

প্রতিধ্বনি।

সব স্তব্ধ হইলে, গভীর নীরবতার মধ্যে সমস্ত জাগরণ ডুবিয়া গেলে, অস্তিত্বের অনুভূতি বিলুপ্ত হইলে, সে মহা-ধ্বনি, দিগন্ত কম্পিত করিয়া, অম্বরে প্রতিধ্বনিত হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শ্রবণ-পথাবলম্বী করিয়া—ঘ্রাণ আস্বাদন দর্শন স্পর্শন সকলকে শ্রবণে পরিণত করিয়া—শ্রবণময় হইয়া শুনিতে পারিলে তবে তাহা অনুভব করিতে পারা যায়। সে ধ্বনিতে জগতের সমস্ত কোলাহল একীভূত হইয়াছে।

* * *

মহা-সম্মিলন।

গ্রীক-দেবতা 'একো' (প্রতিধ্বনি), 'নার্সি-সাসের' প্রণয়ে নিরাশ হইয়া, জগতের অনন্ত বিষাদে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন,—ক্রমে সীমাশূন্য প্রতিধ্বনিতে

পর্য্যবসিত হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রতিধ্বনি কালবক্ষে বিরাজিত রহিয়াছে। গ্রীকজাতির পৌরাণিক সাহিত্য, এখনও প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। আর বৃন্দাবনের যমুনা-লহর-লীলা-তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মোহন বীণার মোহন-ধ্বনি, কতকাল বাজিয়াছিল; এখনও অহরহ বাজিতেছে। জগতের কত দেশের কত জাতির, কত সুখ-দুঃখের, কত আনন্দ-বিষাদের, কত লয় ও সৃষ্টির, কত বিবর্ত্তন-বিকাশের কত শব্দ, ঐ অনন্তের মহাশব্দে সম্মিলিত হইতেছে। তাই মাতা বসুন্ধরা শব্দময়ী—নাদময়ী ওঙ্কার-রূপিণী!

রূপ।

সৌন্দর্য্য।

মানবাত্মা সৌন্দর্য্যের ভিখারী। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের আধার-রূপিণী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সাম্প্রদায়িকতা নাই;—মানুষের সৌন্দর্য্য-পিপাসায় তাহা স্পষ্ট আছে। কল্পনাতীত মোহন সাজে, নদ-নদী, পর্ব্বত-গুহা, আকাশ-অরণ্য, দিবা-নিশা, ঋতু-বর্ষ—সব লইয়া, সমভাবে, প্রকৃতি-দেবী সদাই সুসজ্জিতা। মানুষ, প্রকৃতিরই অনুকরণে সৌন্দর্য্যের সাজে সজ্জিত হইতে চাহে। প্রকৃতি, মানুষকে যে মনুষ্যত্বের আবরণ দিয়া সজ্জিত করিয়াছেন; সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানুষ, সে আবরণ দূরে ফেলিয়া দিয়া, নিজের মনোমত আবরণে সজ্জিত হইতেছে। মানুষের মন চিরপরিবর্ত্তনশীল, প্রকৃতিও পরিবর্ত্তনশীলা। মানুষ যে মানুষ, সেই মানুষই আছে। কিন্তু তাহার সে সৌন্দর্য্য-সুষমা কোথায়?

* * *

সৌন্দর্য্যের স্বরূপ।

দার্শনিক কবি বলিয়া থাকেন—জগৎ সৌন্দর্য্য-সমুদ্ভূত; আবার সৌন্দর্য্যেই তাহার বিলয়। যাহা হইতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই বিলয়—ইহাই জগতের নীতি। হেলেনার লোকললামভূত সৌন্দর্য্য, জগতের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; আবার তাহাতেই বিলীন হইয়াছে। অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী ক্লিওপেট্রা, মৃত্তিকা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; আবার মৃত্তিকাতেই বিলীন হইয়াছেন। আমাদিগের তিলোত্তমা-শকুন্তলার সৌন্দর্য্যও—এই পৃথিবীর জিনিস; পৃথিবীতেই মিশিয়াছে। সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধারভূতা গোকুল-মোহিনী শ্রীরাধিকা, রমণীকুলের বরণীয়া অযোধ্যার লক্ষ্মী মা-জানকী, পাতিব্রত্য-সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থানীয়া সাবিত্রী-দময়ন্তী—সকলের সৌন্দর্য্যই জগতের বক্ষে উদ্ভাসিত রহিয়াছে। জ্ঞানের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য, আত্মার সৌন্দর্য্য, পুণ্যের সৌন্দর্য্য, কর্ত্তব্যের সৌন্দর্য্য—সব সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে—সব সৌন্দর্য্য এক হইয়া প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যের পুষ্টি করিতেছে। তাই প্রেমিক কবির চক্ষে প্রকৃতিদেবী সৌন্দর্য্যের আধাররূপা। সৌন্দর্য্য-পিপাসু মানবাত্মা, প্রকৃতির এই জীবিত সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করেন না কেন? যাহার উদ্ভব আছে—বিলয় নাই; যাহার প্রাণ আছে—ধ্বংস নাই; যাহার পূর্ণতা আছে—হ্রাস নাই;—তাহাই প্রকৃত অনুকরণের সামগ্রী। বিস্মৃত মানুষ, তবে কেন পিপাসা-বিড়ম্বিত? অনন্ত সৌন্দর্য্যে আত্ম-নিমজ্জন কর; পিপাসা নিবারিত হইবে।

সুন্দর।

অনন্ত সুন্দর।

সুন্দর—অনন্ত সুন্দর! তাঁরে যে ভাবে দেখিবে, যে রূপে ভাবিবে, তিনি সুন্দর—অনন্ত সুন্দর! যখন দেখি—তিনি মা-জননী; অমনি মনে হয়—মা-আমার স্নেহ-কারুণ্যের মূর্ত্তিমতী সৌন্দর্য্যশালিনী। যখন দেখি—পিতা ভোলানাথ আশুতোষ; অমনি মনে হয়—আমার অপরাধ-বিস্মৃত সামান্যে-সন্তুষ্ট তিনি অশেষ সৌন্দর্য্যময়। যখন আমি প্রেম-বিহ্বল প্রেমোন্মত্ত প্রাণ; তিনি অমনি হন—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার শ্রীশ্যাম-সুন্দর! সুন্দর—তিনি অনন্ত সুন্দর!

* * *

সর্ব্ব-সুন্দর।

মাতৃ-রূপে সুন্দর, পিতৃ-রূপে সুন্দর, প্রেমিক-রূপে সুন্দর—তিনি অনন্ত সুন্দর! যখন রক্তপদ্মের রক্তিম-দলে চরণপদ্ম প্রকটিত হয়, তখন সুন্দর—কত সুন্দর! যখন ঊষার নবরাগরঞ্জিত বাল-ভানুরূপে ললাটসিন্দুর প্রত্যক্ষ হয়, তখন সুন্দর—কত সুন্দর! যখন বীণা-বিনিন্দিত বিহগ-কণ্ঠ-সুধা-তরঙ্গে মায়ের মোহন কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, তখন সুন্দর—কত সুন্দর! যখন নিরন্ন-গৃহে অন্নপূর্ণা-রূপে, যখন তাপতপ্ত প্রাণে মূর্ত্তিমতী স্নেহ-কারুণ্য-রূপে, যখন শত্রুভয়ভীত সংসারে সাক্ষাৎ অভয়া-রূপে, যখন জ্বালা-যন্ত্রণা-অশান্তির আঁধারে শুভ্র-শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে, মা আমার আবির্ভূতা হন, তখন সুন্দর—কত সুন্দর! আবার যখন—

'শিবং শান্তং লোকানুগ্রহকারকং'

তখন সুন্দর—কত সুন্দর! আরও সুন্দর—সেই

'শুদ্ধং-স্ফটিক-সঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং'

সুন্দর—কত সুন্দর! আর সেই—

'খড়্গশূলবরাভীতিং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং'

কি সুন্দর!

* * *

সৌন্দর্য্যাধার।

সুন্দর—অনন্ত সুন্দর! যে দিকে দেখিবে, যে ভাবে দেখিবে, তিনি সুন্দর—অনন্ত সুন্দর! নয়ন!—তুমি কখনও, নবীন মেঘের ঢলঢল শ্যামল মূর্ত্তি দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়াছ? তিনি আমার—সেই

'নব-নীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং'

মন!—তুমি কি কখনও, জলদ-কোলে সুবঙ্কিম ইন্দ্রধনু দেখিয়া, সৌন্দর্য্য-সুষমায় আত্মহারা হইয়াছ? কিন্তু তাঁর সেই সুচিক্কণ ভ্রমর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগে—

'শঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুঃ।'

শরতের স্নিগ্ধ শশধর—সৌন্দর্য্যের অনন্ত আকর; তুমি কি কখনও, তাপেক্ষা সুন্দরতর কিছু দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, সেই তাঁর বদনচন্দ্র; তাঁর—

'মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটিবিধুং'

তাঁর আমার—

'শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ড-শিখং।
অলকাবলি-মণ্ডিত-ভাল-তলং।
শ্রুতি-দোলিতমাকর-কুণ্ডলকং।
কটি-বেষ্টিত-পীত-পটং সুধটং।'

কি সুন্দর তাঁর—

'ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারুতনুং,
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানু-তনুং।'

কিম্বা তাঁর—

'কল-নূপুর-রাজিত-চারু-পদং,
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গ-মদং।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত-পাদযুগং।'

সুন্দর—তিনি অনন্ত সুন্দর। ভক্ত যে ভাবে দেখিবে, যে রূপে ভাবিবে, তিনি সুন্দর—অনন্ত সুন্দর।

—— * ——

সৃষ্টিকর্ত্তা।

সৃষ্টিকর্ত্তা কে?

জগতের কি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই? অনাদি কাল হইতে অনন্ত আকাশ বিরাজমান; কিন্তু কোনও দিন উহার কোনও সৃষ্টিকর্ত্তাকে কেহ দেখিয়াছেন কি? অনন্ত-বিস্তৃত মহাসমুদ্র, কোথাও প্রশান্তভাবে, কোথাও বীচি-বিক্ষোভিত-বক্ষে, পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। কেহ এক দিনও তাহার নির্ম্মাতার সন্ধান পাইয়াছেন কি? সর্ব্বংসহা ধরিত্রী, কত অনন্ত কোটী প্রাণী—কত অনন্ত কোটী সামগ্রী বক্ষে ধারণ করিয়া, যে প্রকৃতিপুঞ্জ সাজাইয়া রাখিয়াছেন; উহা-দেরই বা সৃষ্টিকর্ত্তা কে আছেন?

* * *

দৃষ্টিশক্তি নাই।

ক্ষুদ্র মনুষ্যের ক্ষীণদৃষ্টি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিল না। তাই কি বলিব—উহাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা কেহ নাই? এ সংসারে আমরা তো এমন কোটী কোটী সামগ্রী দেখিতে পাই, যাহার নির্ম্মাতাকে আমরা দেখি নাই, অথচ যাহার নির্ম্মাতা কেহ-না-কেহ ছিলেন বা আছেন। প্রাচীন কালের যে সকল স্থপতি-চিহ্ন বিদ্যমান,—দীল্লির কুতুব, আগ্রার

তাজ, ইলোরার গিরিগুহা, হিন্দুর প্রাচীন দেবমন্দিরাদি,—আমা-দিগের মধ্যে কে উহাদের নির্ম্মাতাদিগকে দেখিয়াছেন? অধিক কহিব কি, আপনাপন পিতা পিতামোহ প্রপিতামোহ প্রভৃতির বিষয় কহিতে যাইলেও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের পরিচয় সর্ব্বথা প্রদান করিতে পারি না। যখন বিত্তমানের ক্ষুদ্র জ্ঞান পর্য্যন্ত দৃষ্টিশক্তি-বহির্ভূত—অপিচ সংশয়মূলক; তখন সেই অনন্ত জ্ঞানের দূরদৃষ্টি কি প্রকারে থাকিতে পারে?

* * *

নিয়ন্তার নিদর্শন।

অতএব, স্থাবর-জঙ্গম-চরাচর এই বিশ্বের সৃষ্টি-কর্ত্তা যে কেহ নাই, ইহা কোনও ক্রমেই অনুমানসিদ্ধ হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহার নির্ম্মাতা কেহ আছেন বা ছিলেন,—যাঁহার স্মৃতি আমাদিগের ক্ষীণদৃষ্টির অন্ত-রালে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। জাতীয় পুরাণ-ইতিহাস, জাতীয় অতীত কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সংসারে যদি সেই পুরাণ-ইতিহাস না থাকিত, তবে কি করিয়া জানিতাম—আগ্রার তাজ কে নির্ম্মাণ করাইয়া গিয়াছেন, বা কুতুব প্রভৃতির নির্ম্মাণকর্ত্তা কে ছিলেন? ভারতের গৌরব-গাথা, মিশরের 'পিরামিড'-স্তম্ভ, রোমের প্রাধান্য, গ্রীসের প্রাচীনত্ব,—সকলই ইতিহাসের সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিতে হয়। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমার সাক্ষ্য দিবার কি কেহ নাই? হিন্দুর ঐ যে অনন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ বেদান্ত-উপনিষৎ—এ সকল কাহার পরিচয়-চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে? তোমার ক্ষণভঙ্গুর দেহের ক্ষীণ মস্তিষ্ক-প্রসূত ইতিহাস সত্য হইতে পারে, আর সেই তপঃসিদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-মহর্ষি-দিগের আপ্তবাক্য বেদ-বেদান্ত মিথ্যা হইয়া যাইবে? -নিদর্শন

কি আরও নাই? ঐ দেখ প্রত্যক্ষ নিদর্শন—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য-নারায়ণ—যিনি সাকার-নিরাকার স্থূল-সূক্ষ্ম সর্ব্বভাবে চরাচরে ওতঃপ্রোত বিরাজমান—তাঁহাকে দেখিয়াও কি নির্ম্মাতার নিদর্শন পাইতে পারি না? একটু সন্ধান করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে সুস্পষ্ট দেখা যায়।

—— * ——

স্বধর্ম্ম-সাধনে।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মবিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

ধর্ম্মভাবে।

মানুষ যখন আধিব্যাধিশোকতাপের যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হয়, তখনই মানুষের প্রাণে ধর্ম্মের ভাব জাগিয়া উঠে,—তখনই মানুষ জগদীশ্বরের পরমেশ্বরের সন্ধান লইবার জন্য ব্যাকুল হয়। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, জগতে যত ধার্ম্মিক মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছে, সকলই সেই বিষম প্রতিঘাতের ফল। অধর্ম্মের উৎকট উপদ্রবে সংসার যখনই বিব্রত বিপন্ন হইয়া পড়ে, তখনই ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা বাজিতে আরম্ভ হয়। যখনই যে দেশে যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই মূলে এই তত্ত্ব প্রকটিত দেখি।

* * *

পরীক্ষা।

সে বড় বিষম পরীক্ষার ক্ষেত্র। যখন বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে সমাজ-তরণী বিক্ষুব্ধ হয়, সে বড় বিষম সমস্যার সময়। সেই সমস্যা-সঙ্কটে পড়িয়াই অনেক সময় মানুষ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হয়; সেই সমস্যা-সঙ্কটে সমাজ-তরণী পাছে

বিপর্য্যস্ত হয়, তাই ভগবান সাবধান করিয়াছেন,—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' সে সঙ্কটে নিধন শ্রেয়ঃ, কিন্তু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে নাই। এ বড় মহান্ উপদেশ। এ উপদেশের মূল্য নাই। কত সময় কত কারণে মানুষ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করে; কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও প্রলোভনে পড়িয়া, কখনও বা বিপদের বিভীষিকায়, মানুষ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু যদি তার স্মরণ থাকে—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ;' সে বোধ হয় কখনও ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে—পরধর্ম্মের আশ্রয়-আকাঙ্ক্ষায়—প্রলুব্ধ হয় না।

* * *

ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে।

কত দিনে মানুষের প্রাণে শ্রীমদ্ভবদ্গীতার ঐ অমূল্য উপদেশ স্থান পাইবে! কত দিনে মানুষ প্রাণে প্রাণে অনুধাবন করিবে,—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' চারিদিকে মায়া-মরীচিকা, চারিদিকে কুহক-জাল। কে সে মরীচিকা উত্তীর্ণ হইবে? কে সে কুহক-জাল ছিন্ন করিবে? দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট অনশনে-আসন্ন-মৃত্যু নরনারীকে ডাকিয়া যদি কেহ বলে,—'এস, জীবন বাঁচাও, পর-ধর্ম্ম গ্রহণ কর;' সে বুভুক্ষু জন কখনও স্থির থাকিতে পারে না,—প্রাণের দায়ে প্রলোভনে পড়িয়া তাহাকে পর-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়। যখন এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে ধর্ম্ম-গ্রন্থ ধরিয়া প্রাণে বিষম বিভীষিকা উৎপাদন করে; তখনও মানব ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপ সহস্র সহস্র কোটী সঙ্কট-সমস্যার মধ্যে মানুষ স্বধর্ম্ম ত্যাগে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে বাধ্য হয়।

* * *

একাকার-চেষ্টায়।

সঙ্কট-সমস্যা কত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই সম্মুখীন হয়! নীতিতত্ত্বজ্ঞ-রূপে তাহার যে মায়া-মূর্ত্তি তাহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বড়ই কঠিন। যিনি যে সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা প্রয়াসে গৃহীত-ব্রত, তিনি সেই সম্প্রদায়েরই একচ্ছত্র-প্রভাব বিস্তার-পক্ষে প্রযত্ন-পর আছেন। তাঁহাদের অনেকেরই মুখ্য বাণী এই যে—'পৃথিবীতে এক ধর্ম্ম—এক সমাজ প্রবর্ত্তিত হইলেই পৃথিবীতে সুখ উথলিয়া উঠিবে।' হিন্দু ভিন্ন প্রায় অন্য সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পারিপার্শ্বিক অন্য সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে এইরূপ ভাবে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছেন। ভারতবর্ষে হিন্দুর মধ্যে বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় আছে। তাহারা সময় সময় সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগকে এক করিবার অছিলায়, এক এক সময়ে ভারতবর্ষে এক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই একাকারের প্রসঙ্গ উঠে।

* * *

একধর্ম্মের প্রস্তাব।

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্মাচার্য্য বিশপ ওয়েলড়ন, ঐরূপ একাকারের এক অভিনব আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। আজিকালি বিদ্যালয়সমূহে ধর্ম্মশিক্ষাদানের প্রস্তাব সময় সময় যে উঠিয়া থাকে, বিশপ ওয়েলডনের আন্দোলন তাহার আদিভূত বলিয়া অনেকে মনে করেন। ওয়েলড়ন বলিতেন,—"ভারতবর্ষকে যদি রাজভক্ত করিতে চাও, তাহা হইলে ভারতবাসীকে এক-ধর্ম্মাবলম্বী করিতে চেষ্টা কর।" তাঁহার সে কথা বলার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, 'ভারতবাসী সকলকে যদি খৃষ্টান করিতে পারা যাইত, তাহা

হইলে ভারতে শান্তি-সুশৃঙ্খলার অবধি থাকিত না, তাহা হইলে ভারত-প্রজা আপনা-আপনি রাজ-ভক্ত হইত;—বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা মনে করিয়া, তাহারা কখনই রাজার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইত না।' ওয়েল্‌ডনের এই উপদেশে সে সময় অনেকেই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন! পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই উপলক্ষে বিদ্যালয়-সমূহে ধর্ম্ম-শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু এক ধর্ম্ম এক-সমাজ হইলেই যে শান্তি প্রবাহে দেশ ভাসমান হয়, তাহা কোনক্রমেই মনে করা যায় না। এক-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেই যে সকলে একই শাসন মান্য করিবে, ঐতিহাসিকগণ ইহার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে এখনও পারেন নাই। তাহা হইলে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-জগৎ—ইউরোপ—এতদিন কামান-বারুদ ত্যাগ করিয়া অসি-বর্ম্ম সমুদ্র-জলে ভাসাইয়া দিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টীয় জগৎ এখনও যে নিদারুণ সংগ্রামগীতি গাহিয়া বেড়াইতেছেন, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় বিশ্ব বিকম্পিত করিয়া তুলিতেছেন, সগর্ব্ব পদাঘাতে বসুন্ধরার শান্তিকুঞ্জ চূর্ণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া কখনও মনে হয় না যে এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে, সকল জাতিই একবারে শান্ত হইয়া যাইবে! তবে শান্তি কিসে লাভ হয়? আমরা বলি—স্বধর্ম্ম-পালনে। আমার ধর্ম্মমত অপরে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, আমি যদি স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হই, আর অপরেও যদি স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে প্রবৃদ্ধ হন, তাহাতেই শ্রেয়ঃলাভ ঘটিয়া থাকে। আর, সেই জন্যই ভগবান বলিয়াছেন,—

'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।'

শ্রেয়ঃলাভে।

পুরুষকার?

প্রাক্তন—কি পুরুষকার? অদৃষ্ট—কি কর্ম্ম-ফল? সেই তর্ক-তরঙ্গে সংসার আবহমান উদ্বেলিত। শাস্ত্র অশেষ প্রকারে সে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মানুষ নিয়ত সে কথা লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছে। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত আজিও কোনও মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিল না! প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া মানুষ যখন জয়লাভ করে, তখন গর্ব্বস্ফীত হইয়া আপন পুরুষকারের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। আবার অনুকূল স্রোত প্রাপ্ত হইয়াও তাহার উদ্যম যখন বিপর্য্যস্ত হয়, সে তখন আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। ফলতঃ, দৈব কি কর্ম্ম—ফলাফলের নিয়ন্তা কে, সে তর্কের মীমাংসায় চিত্ত নিয়ত বিভ্রম-গ্রস্ত। তাই মানুষ কখনও বা দৈবের, কখনও বা পুরুষকারের প্রাধান্য মানিয়া থাকে।

* * *

সংশয়-প্রশ্ন।

শ্রীরামচন্দ্রের মনেও একদিন এইরূপ সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। সংশয়াপন্ন হইয়া তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ তাহাতে উত্তর দেন,—'স্বীয় কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইলে, এই কর্ম্মে এই প্রকার ফল হয়,—এই বাক্যই দৈব নামে প্রসিদ্ধ। তাহাতেই মূঢ় ব্যক্তিগণ ভ্রান্তিবশতঃ রজ্জুতে সর্প-জ্ঞানের ন্যায় দৈব আছে বলিয়া নিশ্চয় বসিয়া আছে। যে দুর্ম্মতি, মূঢ় ব্যক্তির অনুমান-সিদ্ধ দৈব মানিয়া থাকে, 'অগ্নিতেও দৈবাৎ দগ্ধ হইবে না' এই স্থির করিয়া তাহার অগ্নিতে পড়া উচিত। এই

জগতে দৈবেরই যদি কর্ত্তৃত্ব থাকে, তাহা হইলে পুরুষের সকল কার্য্যেই চেষ্টার প্রয়োজন কি? তাহা হইলে দৈবই স্নান, দান ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিত। তাহা হইলে শাস্ত্রোপদেশ কেন?—তাহা হইলে কোনও শাস্ত্রোপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? দৈবই সকল কর্ম্ম করিবে, পুরুষ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকুক। শবত্ব ব্যতীত এই জগতে নিষ্পন্দ-ভাব আর দেখা যায় না; স্পন্দ (হস্ত পদাদির চালন) হইতে ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; অতএব দৈব নিষ্প্রয়োজন। মূর্ত্তিহীন দৈবের সহিত মূর্ত্তিমান পুরুষের সমান কর্ত্তৃত্ব (সম্ভবে না) দেখা যায় না; অতএব দৈব নিষ্প্রয়োজন। লেখনী বা ক্ষুর প্রভৃতি উপকরণ পাইলে হস্তদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে একটী না একটী কর্ত্তা হয়। যুগপৎ হস্তদ্বয় দ্বারা লিখন অসম্ভব হইলেও অন্ততঃ একটীর কর্ত্তৃত্ব থাকে। কিন্তু হস্তপদাদি অঙ্গ নষ্ট হইলে, দৈব কি কাহারও কিছু করিয়া দিয়া থাকে?

* * *

সংশয়-নিরসনে।

তবে সংসারে এমন বিপরীত দৃশ্য দর্শন করি কেন? একজন জন্মিয়াই ক্রোড়পতি হয়, আর একজন সারা-জীবন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াও উদরান্ন সংস্থানে অসমর্থ কেন? একজন বিনা-আয়াসে ঐশ্বর্য্যের সুখময় ক্রোড়ে লালিত-পালিত-বর্দ্ধিত হইতেছে, আর একজন অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়াও দুর্দ্দশা-পঙ্ক হইতে উদ্ধার হইতে পারিতেছে না। যদি পৌরুষ বা কর্ম্মের ফলই প্রবল হয়, তবে এরূপ ঘটনা অহর্নিশ প্রত্যক্ষ করিতেছি কেন? এই সংশয়-সন্দেহ নিরসনের জন্য শাস্ত্র দৈবের বা অদৃষ্টের স্ব-রূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রমতে দৈব বা অদৃষ্টও কর্ম্ম-বিশেষ। প্রাক্তন-

পৌরুষ বা প্রাক্তন-কর্ম্ম ব্যতীত স্বতন্ত্র দৈব নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠ এ বিষয়ও বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'প্রাক্তন-কর্ম্ম ব্যতীত দৈব আর নাই। প্রবল পুরুষ যেমন বালককে অনায়াসে পরাভব করিতে পারে, সেইরূপ ঐহিক কর্ম্ম দ্বারা দৈবকেও অনায়াসে জয় (আয়ত্ত) করা যাইতে পারে। পূর্ব্বকৃত অসৎকর্ম্মকে যেমন সৎ কর্ম্ম দ্বারা শুভে পরিণত করা যায়, প্রাক্তন কর্ম্মকেও সেইরূপ করা যাইতে পারে। যাহারা মোহপরবশ হইয়া সেই দৈবের (প্রাক্তন কর্ম্মের) জয়ার্থ যত্ন করে না, সেই দৈবপরায়ণ ব্যক্তিগণ দীনহীন পারম ও মূঢ়।··· প্রাক্তন ও ঐহিক পুরুষকার-দ্বয় মেষ-দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করে। তন্মধ্যে যাহার বল অধিক, তাহারই ক্ষণমধ্যে জয় হইয়া থাকে। রাজ-বংশের অভাবে অমাত্যগণ যদি মঙ্গলালঙ্কার-ভূষিত গজাদি দ্বারা ভিক্ষুককে নৃপ করে, সে বিষয়ে অমাত্য ও পৌর প্রভৃতিরই প্রযত্নের বল জানিবে। যেমন পুরুষকার বলে অন্নকে দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা হয়, সেরূপ বলবান ব্যক্তি পৌরুষ-বলেই অন্যকে চূর্ণ করিয়া থাকে।'

* * *

কর্ত্তব্য কি?

তবেই বুঝা যাইতেছে, শাস্ত্র বলিতেছেন,—সংসারে যদি জয়-শ্রীলাভ করিতে চাও, কর্ম্মী হও; পুরুষকার-বলে দৈবকে প্রতিহত কর। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে প্রশ্ন করেন,—"যাহা পূর্ব্ব-সঞ্চিত কর্ম্ম, তাহাই দৈব। সুতরাং প্রাক্তন ও বাসনা সমূহ আমাকে যেরূপে নিয়োজিত করিতেছে, আমি তাহাই করিতেছি। আমি পরবশ।" বশিষ্ঠ তাহাতে উত্তর দেন,—"হে রাম! সেই জন্যই তো এক্ষণে

স্বপ্রযত্ন পুরুষকার দ্বারাই তোমাকে শ্রেয়ঃ লাভ করিতে হইবে ; অন্য কোনও প্রকারে নহে। হে রাম ! শুভ অশুভ বিবিধ প্রাক্তন বাসনা-জাল তোমার আছে ; অথবা এতদন্যতর অর্থাৎ হয় শুভ না হয় অশুভ, বাসনা-জাল তোমার আছে। অধুনা তুমি যদি প্রাক্তন শুভ বাসনা দ্বারা পরিচালিত হও, তাহা হইলে তদীয় মঙ্গলময় পরিণামরূপী পৌরষ দ্বারাই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভ বাসনা-জাল তোমাকে সঙ্কট পথে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রযত্ন-সহকারে বলপূর্ব্বক পরাজয় করিবে। বাসনা-নদী শুভ অশুভ উভয় পথেই প্রধাবিত ; পৌরুষ-প্রযত্ন দ্বারা উহাকে শুভ পথেই প্রযোজিত করিতে হইবে। হে বলিষ্ঠ-প্রবর ! স্বীয় মন অশুভ পথে প্রবিষ্ট হইলেও, তুমি, তাহাকে পুরুষার্থ বলে শুভ পথে অবতীর্ণ করিবে। প্রাণীর চিত্ত শিশুর ন্যায় অস্থির। তাহাকে অশুভ হইতে অপসারিত করিলে শুভ পথে গমন করে ; আবার শুভ হইতে অপসারিত করিলে অশুভ পথে গমন করে। অতএব চিত্তকে বলপূর্ব্বক শুভ পথে পরিচালিত করিবে। এইরূপে চিত্তরূপ শিশুকে সত্বরই উপায় বলে (রাগ, দ্বেষ, বৈষম্য ত্যাগ করাইয়া) স্বাভাবিক সমতা প্রাপ্ত করিবে। পরে শনৈঃশনৈঃ আত্মস্বরূপে নিরোধরূপ পৌরুষ-প্রযত্নে পালন করিবে।' ফলতঃ শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া শুভ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, অশুভ প্রাক্তন বিধ্বস্ত হয় ; শুভ-কর্ম্মের শুভ ফল আপনিই প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। দৈবের বা অদৃষ্টের ভাবনা না ভাবিয়া, কর্ম্মকে শুভ পথে চালাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেই সংসারে শ্রেয়ঃলাভ অবশ্যম্ভাবী।

দুঃখনিবৃত্তি।

দুঃখ-প্রবাহ।

দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য সংসারে চির-সংগ্রাম চলিয়াছে। সংসারে মানুষ যাহা কিছু করিতেছে, সকলেরই উদ্দেশ্য—দুঃখ-নিবৃত্তি। কিন্তু কোথাও সংসারীর দুঃখের নিবৃত্তি দেখিতে পাই না। দুঃখের উপর নূতন দুঃখ আসিয়া মানুষকে নিয়ত বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। নদী-বক্ষে প্রবাহের পর প্রবাহ চলিয়াছে; মহাসাগরে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিয়াছে; পুরাতন যাইতেছে, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে! এ সংসারে মনুষ্যের উপর দুঃখের আক্রমণ সেই ভাবেই চলিয়াছে। মানুষ সহস্র চেষ্টায় এক দুঃখ দূর করিতে না করিতেই আবার নূতন দুঃখ আসিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। সংসারে বুঝি দুঃখ-প্রবাহের অন্ত নাই! দুঃখ-নিবৃত্তির পক্ষে মনুষ্যের চেষ্টারও শেষ দেখিতে পাই না।

* * *

জ্ঞানে—নিবৃত্তি।

মনুষ্যের দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য শাস্ত্র কতই উপায় উদ্ভাবন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের দর্শন-শাস্ত্র-সমূহ মনুষ্যের দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্বেষণে নিরত। সাঙ্খ্য দুঃখকে ত্রিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়া সেই ত্রিবিধ দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়ান্বেষণ করিয়াছেন। সাঙ্খ্য বলিয়াছেন,—'পুরুষার্থ প্রভাবে ত্রিবিধ দুঃখই নাশ হইতে পারে; আর জ্ঞান-লাভই সেই পুরুষার্থ।' বৈশেষিক-দর্শনেরও প্রতিপাদ্য—আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি। বৈশেষিকের মতেও তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ হইলেই দুঃখ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সকল দর্শনই এতদ্বিষয়ে প্রায় এক-মত। যদিও সে জ্ঞান-লাভের উপায়-সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়,

কিন্তু জ্ঞান-লাভেই যে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, তদ্বিষয়ে প্রায়ই মতান্তর দেখিতে পাই না। কোন্ পথ দিয়া কি ভাবে অগ্রসর হইলে সেই জ্ঞান-লাভ হইতে পারে—যে জ্ঞানে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি সম্ভবপর! দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য প্রকৃত আগ্রহান্বিত হইলে, সেই পথ অনুসন্ধান করাই প্রথম প্রয়োজন।

* * *

নাশে—নিবৃত্তি।

কুলগুরু বশিষ্ঠের সহিত রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের এক দিন এই দুঃখ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছিল। দুঃখ-নিবৃত্তি বিষয়ে নানারূপ বিতর্কের পর মহর্ষি বশিষ্ঠ সংক্ষেপে বলেন,—"যথার্থ কথা বলিতেছি, 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞান তোমার যত ক্ষণ থাকিবে, তত ক্ষণ তুমি দুঃখ-নির্মুক্ত হইতে পারিবে না; যখন তোমার 'আমি' 'আমার' জ্ঞান বিদূরিত হইবে, তখনই তুমি দুঃখ-মুক্ত হইবে; এক্ষণে তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।" যাহা নাই, যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহার অস্তিত্বাভাব, তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়াই দুঃখ। সে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভবপর নহে। যাহা নাই, তাহা কিরূপে লাভ করিতে পার? এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য মহর্ষি পুনরপি কহেন,—"যথার্থই 'আমি, 'আমার' বলিয়া কোনও পদার্থ নাই; আছে কেবল একমাত্র পরাৎপর শিব পরমাত্মা। সেই শান্তিময় আত্মা হইতেই এই প্রতিভাসিক দৃশ্য বস্তু। কিন্তু এই দৃশ্যের কোনও স্বরূপ নাই, ইহা অলীক। জগৎ নামক এই যে দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ফলে ইহা সুবর্ণের বলয়ের ন্যায় শিবময় আত্মা হইতে পৃথক কোনও বস্তু নহে। ইহাকে পৃথকরূপে না জানাকেই সাধুগণ ইহার ক্ষয় বলিয়া

থাকেন। ইহার ক্ষয় হইয়া গেলে, একমাত্র সত্য সেই পরব্রহ্মই থাকেন।” তখন আর দুঃখ কোথায় থাকিবে? তখন সকলই আনন্দময়—সকলই পরমাত্মা।

* * *

সাধু-প্রসঙ্গ।

কোনও সাধু পুরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যালয়ের কয়েকটী ছাত্র এক দিন তাঁহাকে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক-জন বলেন,—‘সংসারের যে কোনও দুই ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করি না কেন, তাহাদের মধ্যে সুখ-দুঃখের তারতম্য দেখিতে পাই। আমার প্রতিবাসী দুঃশীল, জন্মাবধি কুকার্য্যে রত; অথচ, তাহার সুখৈশ্বর্য্যের অন্ত নাই। আর, আমি কখনও কোনও অপকর্ম্ম করি নাই, সর্ব্বদা সৎপথে চলিতেছি; অথচ, আমার সাংসারিক কষ্টের অবধি নাই। এরূপ ঘটিবার কারণ কি? পরমেশ্বরের এ পক্ষপাতিত্বের বিষয় চিন্তা করিতেও কষ্ট হয়।’ ছাত্রগণ এইরূপ একে একে একই ভাবের কথা কহিয়া যান। সংসারে এক জন বিনা-আয়াসে কেন বড় হয়, অপর এক-জন সহস্র চেষ্টায়ও কেন নীচের পড়িয়া থাকে;—ছাত্র-গণের প্রশ্নের প্রধানতঃ ইহাই মূল লক্ষ্য ছিল। ছাত্র-গণের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, সাধু পুরুষ উত্তর দেন,—‘আপনাদের দুশ্চিন্তাই আপনাদের কষ্টের মূল। আপনারা যদি জানিতেন,—আপনারাই বা কে, আর আপনাদের সুখ-দুঃখের নিয়ন্তাই বা কে, তাহা হইলে আপনাদের অন্তরে কোনও কষ্টই উপস্থিত হইত না। এ সংসারে কেহ বা সুখ ভোগ করিতেছে, আর কেহ বা দুঃখের দাবদাহে দগ্ধীভূত হইতেছে। কোন্ কার্য্যটী কাহার ইচ্ছার

অধীন? এই তত্ত্ব উপলব্ধি হইলেই সকল দুঃখ দূরে হইতে পারে! এই পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবীর—এই স্থাবর-জঙ্গম-লোকচরাচর কোনও সামগ্রীরই—স্বতন্ত্র সত্ত্বা নাই। সেই বিশ্বনাথ এই বিশ্ব-রূপে বিরাজমান। এ সংসার—এই চেতন-অচেতন-জড়-অজড়-পূর্ণ বিশ্ব—তাঁহারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র। তাঁহার আপন আবশ্যকের জন্য যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্য্য করার প্রয়োজন হয়, সেই অঙ্গের দ্বারা তিনি সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। দুঃশীল-রূপ অঙ্গের দ্বারা অর্থের অপব্যয়-রূপ কর্ম্ম তিনিই করাইতেছেন; আর সে কর্ম্মে তাঁহারই কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। আবার তুমি-আমি-রূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও তাঁহার আবশ্যকানুরূপ কর্ম্মই সম্পাদিত হইতেছে। স্থূলতঃ, এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, মানুষের আর কোনই কষ্টের কারণ থাকে না;—এক জনের অবস্থার সহিত আপনার অবস্থার তুলনা করিতে গিয়াও মানুষ কখনও কষ্ট অনুভব করে না।'

* * *

শুভ-ফলের মূল।

অনুভাবনাই কষ্ট, বৈ ত নয়! নচেৎ, যিনি মূল-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার আবার কষ্ট কি? "বিশ্বের অভ্যন্তরগত মজ্জা, অভ্যন্তরে যে বীজাদি উৎপাদন করে, সেই বীজাদি যেমন বিশ্ব হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ চিৎরূপে আত্মা আপনাতে যে চিত্ত নামক ত্রিপুটী রচনা করেন, সেই ত্রিপুটী তাঁহা হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। ভূর্লোকের অন্তর্গত জম্বু-দ্বীপাদি বিভাগ যেমন ভূর্লোক হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ আকাশের অন্তর্গত পৃথিব্যাদি পদার্থও পরমাত্মা হইতে অণুমাত্রও পৃথক নহে। যেমন জল ও জলের

অন্তর্গত দ্রবত্ব পরস্পর অভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ চিন্ময় ও চিত্ত একই পদার্থ। জলে যেমন দ্রবত্ব ও তেজে যেমন আলোক বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্মেও চিদ্ভাব ও চিত্তভাব দুই-ই আছে। দৃশ্য প্রকাশ করাই চিতির কর্ম্ম; সেই কূটস্থ চৈতন্য হইতে ঐ দৃশ্য, ভ্রম-প্রতীয়মান যক্ষের ন্যায় বৃথাই উদিত হইয়া থাকে। বস্তু-গত্যা তাহা উদিত নহে। অতএব মনুষ্যের নিজের কোনও কর্ম্ম বা কর্তৃত্ব নাই, ইহা স্থির।" এই ভাব বুঝিয়া, এ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া, যিনি কোনও কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাঁহার কর্ম্ম দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার দুঃখ-নিবৃত্তি সাধিত হইবে। এই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিয়া গেলে, সে কর্ম্মের শুভফল অবশ্যম্ভাবী। এ ভাবের ভাবুক হইলে দুঃখ-নিবৃত্তি অবশ্যই হইবে।

—— * ——

সর্ব্বস্বরূপ।

নাম-রূপ।

মানুষের প্রাণ, জীবনে কখন-না-কখনও ভগবানের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হয়। অনুসন্ধিৎসার উপযোগিতা-অনুসারে শাস্ত্র অনুসন্ধিৎসু জনগণকে ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব শিক্ষা দেন। তিনি কেমন?—তিনি কোথায়?—তাঁহার স্বরূপ কি?—ইহাই মানুষের অনুসন্ধানের বিষয়। মৃগের নাভিমূলে কস্তুরিকা সঞ্চিত থাকে; কিন্তু মৃগ, সেই গন্ধে বিভোর হইয়া, কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া, উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। মানুষেরও সেইরূপ বিভ্রম। তিনি কোথায় নাই? জলস্থলমরুদ্ব্যোম বিশ্বচরাচর তিনি কোথায় নহেন? তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, আবার তিনি

মহৎ হইতে মহৎ। উচ্চতায় তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘা বা ধবলাগিরি; বিশালতায় তিনি প্রশান্ত মহাসাগর; আবার ক্ষুদ্রতায় তিনি দৃষ্টির অগোচর পরমাণু-কণা। বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন ভগবানের স্বরূপ-তত্ত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, ভগবান তখন বিরাট্ বিশ্বরূপে তাঁহার সম্মুখে প্রকট হন। সেই বিরাট্ বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত হইয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

> "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
> ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
> অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
> নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

অর্জ্জুন যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই ভগবানের স্বরূপ। দেখিয়াছিলেন—তাঁহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই। দেখিয়াছিলেন—তাঁহার রূপ অনাদি। সুতরাং বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার নাম অনন্ত। প্রতিনিয়ত চক্ষের উপর সেই রূপ প্রতিভাত; প্রতিনিয়ত কর্ণে কর্ণে সেই নাম প্রতিধ্বনিত। তাঁহার সেই অনাদি রূপ দর্শন করিয়াও—তাঁহার সেই অনন্ত নামের পরিচয় পাইয়াও—সংসার কেন উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়? তাঁহার যে রূপ হৃদয়ে ধারণা করিবে, তাঁহাকে যে নাম ধরিয়াই আহ্বান করিবে, সেই নামে সেই রূপেই তিনি ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। তিনি সর্ব্বরূপে সর্ব্বঘটে সর্ব্বপটে বিরাজিত। তাই তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপ। বিশ্বের সর্ব্ব পরমাণুতে তিনি পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি বিশ্বরূপ বিশ্বেশ্বর।

—*—

ভক্তিকল্পতরু ।

প্রাণ কি চায় ?

মানুষের প্রাণ প্রতিনিয়ত একটী সামগ্রীর অনুসন্ধানে ফিরিতেছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু—সেও সেই সামগ্রী খুঁজিতেছে; আসন্নমৃত্যুশয্যাশায়ী অশীতিপর বৃদ্ধ—তিনিও সেই সামগ্রী খুঁজিতেছেন। সংসারে যে ব্যক্তি যে কোনও কার্য্য করিতেছে, সকলেই সেই সামগ্রী-লাভের আশায় প্রণোদিত। কেবল মনুষ্যই বা বলি কেন, সৃষ্ট-প্রাণিমাত্রেই প্রতিনিয়ত সেই সামগ্রীর সন্ধান করিয়া ছুটিতেছে। সংসারের সকলে যাহার অনুসন্ধানে ফিরিতেছে, যে সামগ্রীর প্রতি সকলেরই সমান অনুরাগ, সে এমন কি সামগ্রী? স্রষ্টার সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে; ঈশ্বরের অস্তিত্বেও—কেহ বা বিশ্বাসবান, কেহ বা সম্পূর্ণ সন্দিহান। কিন্তু এমন সামগ্রী কি থাকিতে পারে, সকলে যাহার প্রতি সমভাবে আকৃষ্ট—সকলে যাহাকে প্রতিনিয়ত খুঁজিতেছে।

* * *

সুখ।

সেই সামগ্রীকে সুখ, আনন্দ বা শান্তি বলিতে পারি। সুখ, আনন্দ বা শান্তি চায় না,—সংসারে এমন কে আছে? মুহূর্ত্ত মধ্যে যাহাকে মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে, সেই মুমুর্ষু ব্যক্তিও একটু শান্তি চাহিতেছে। যে আত্মহত্যা করে, তাহার বিশ্বাস—মরণেই তাহার সুখ-শান্তি। মানুষের কর্ম্মমাত্রই সুখ-সাধনে নিয়োজিত। যোগ-পরায়ণ যোগী একমনে একধ্যানে যোগাসনে বসিয়া আছেন; দেহের উপর বল্মীক-স্তূপ জন্মিয়া গেল; তাহার উপরে বৃক্ষ-লতাদি উৎপন্ন হইল; তথাপি তাঁহার যোগ-ভঙ্গ হইল না! তাঁহার এ যোগ-সাধনা কিসের জন্য? সুখের জন্য—আনন্দের জন্য—শান্তির

জন্য নহে কি? যদি আত্মায় আত্মসম্মিলন তাঁহার লক্ষ্য হয়, সেই লক্ষ্যকে সুখের—আনন্দের—শান্তির চরম পরিণতি-প্রাপ্তি ভিন্ন অন্য কি বলিতে পারি?

* * *

সুখ কোথায়?

সৎকার্য্য, অসৎকার্য্য—সকল কার্য্যেরই মূল লক্ষ্য—সুখ-সাধন। সুখের বা আনন্দের নানা স্তর—নানা পর্য্যায় থাকিতে পারে। কিন্তু মূল—সুখান্বেষণ ভিন্ন কর্ম্মের লক্ষ্য অন্য কিছুই হইতে পারে না। দাতার দান-ধর্ম্মে যে আত্মপ্রসাদ-লাভ,—তাহা সুখেরই একটী অঙ্গ-বিশেষ। হিন্দু দোল-দুর্গোৎসব পূজা-পার্ব্বণ করেন;—সেও আনন্দের জন্য। দুষ্কর্ম্মকারীর দুষ্কর্ম্মকেই বা কি বলিয়া মনে করিতে পারি? সেও কি সুখের জন্যই দুষ্কর্ম্মাচারণ করিতেছে না? দস্যু দস্যু-বৃত্তি করে, নরহন্তা নরহত্যা করে, প্রবঞ্চক প্রবঞ্চনা করে, বিশ্বাস-ঘাতক বিশ্বাসঘাতকতা করে;—তাহাদেরও মূল লক্ষ্য—সুখ-সাধন নহে কি? সুখের জন্যই সংসার পাগল হইয়া আছে। যাহার যেরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি, যাহার যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা,—সে সেইরূপ-ভাবেই সুখের অন্বেষণে ফিরিতেছে! সকলের সকল কার্য্যে সুখ-সমাগম হইতেছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু সুখান্বেষণে যে সকলেই ফিরিতেছে, তাহাতে আদৌ সংশয় নাই।

* * *

সুখ-লাভের পথ।

নানা জনে নানা পথে সুখান্বেষণে প্রধাবিত। কিন্তু পথ বড়ই কুটিল—বড়ই পিচ্ছিল। সে পথে অগ্রসর হইতে গিয়া কেহ বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া বিপথে পড়িতেছেন; কেহ বা অগ্রসর হইবার সময় পুনঃপুনঃ প্রতিহত হইয়া বিড়ম্বিত

হইতেছেন। অধিকাংশেরই এই অবস্থা। তবে কি কেহ সে পথ অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না? পারিতেছেন—যাঁহারা শাস্ত্রানুশাসন মান্য করিয়া চলিতেছেন—যাঁহারা মহাজন-গণের অনুসরণ করিতে পারিয়াছেন—যাঁহারা বিবেক-বুদ্ধির অনুসারী হইয়াছেন। শাস্ত্র—সেই পথ দেখাইবার জন্যই আলোকা-বর্ত্তিকা ধরিয়া আছেন;—মহাজনগণ সেই পথ দেখাইবার জন্যই হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছেন;—বিবেকবাণী সেই পথের দিকেই অগ্রসর করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেছেন। হিন্দুর শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি—কি বিশদভাবেই সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন! দর্শন-শাস্ত্রাদির মূল লক্ষ্যই তো সেই পথ-প্রদর্শন! আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য যে উপদেশ, তাহার উদ্দেশ্য সুখলাভ—চরম সুখলাভ নহে কি?

* * *

পথ—ভক্তি।

মানুষের প্রকৃতি যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, মানুষের শিক্ষা যেরূপ বিভিন্ন প্রকার, সুখলাভের পথও সেইরূপ শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী প্রশস্ত সরল পথের নাম—ভক্তি। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রেই এই পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ পথের পথিক হইবার জন্য প্রকৃতি প্রথম হইতেই মনুষ্যকে উদ্বোধিত করিয়া থাকেন। সংসারে বোধ হয় এমন মনুষ্য কেহই নাই, জীবনে যিনি একবারও ভক্তি-পথের পথিক না হইয়াছেন! অতি বড় পাষণ্ডের প্রাণেও, সচরাচর দেখিতে পাই, মুমূর্ষু-কালেও ভক্তির উদয় হয়। জীবনে এক দিন না এক দিন ভক্তিপ্লুত-কণ্ঠে কাতর-স্বরে মানুষকে ডাকিতে শুনা যায়,—'ভগবান! রক্ষা কর।' অনেক বড় বড় নাস্তিকের

জীবনেও এইরূপ পরিবর্ত্তন, ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ফলতঃ, জীবনে কোনও-না-কোনও-সময়ে মানুষের মনে ভক্তির উদয় অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥"

নিষ্কামই হউন, অথবা সর্ব্বপ্রকার কামনাযুক্তই হউন, মুক্তিপ্রার্থী; উদারবুদ্ধি ব্যক্তি একান্ত ভক্তি-সহযোগে পরম পুরুষের উপাসনা করিবেন। দুঃখ-নিবৃত্তিরই নামান্তর—মুক্তি, কৈবল্য-প্রাপ্তি বা নিঃশ্রেয়স-লাভ। সেই অবস্থাই চরম সুখের অবস্থা। শাস্ত্র উপদেশ দিলেন, সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম যেরূপ ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক, ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তি অবশ্যই অধিগত হয়। মূলে ভক্তি প্রয়োজন।

* *

জ্ঞান ও ভক্তি।

ভক্তি-শাস্ত্র—ভক্তির নিকট জ্ঞানের গৌরব খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছেন। যে জ্ঞান ভক্তি-বিহীন, সে জ্ঞান কোনই ফলোপধায়ক নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—'হে হরি! তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয় হইলেও সংসার-পাশ হইতে মুক্তি-লাভের অসম্ভাবনা দেখি না। কেন-না, যাঁহারা জ্ঞান-লাভের নিমিত্ত অল্পমাত্র প্রয়াস ব্যতিরেকেও স্বস্থানে অবস্থিতি-পূর্ব্বক সাধুজন-কথিত কর্ণগত ভবদীয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দেহ-বাক্য-মন দ্বারা উহার আদর করতঃ কেবল জীবনধারণ করেন, হে অজিত! তাঁহারা ত্রিলোকের মধ্যে তোমাকে জয় করিতে পারেন; তাঁহাদিগের পক্ষে তুমি দুর্লভ নহ।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন,—

"শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥"

'যাহারা ক্ষুদ্র-প্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া স্থূলপ্রমাণ তুষ সকল তাড়ন করে, তাহাদিগের যেরূপ কোনও ফল হয় না, সেইরূপ যাঁহারা তোমার মঙ্গলময় ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান-লাভেই যত্ন করেন, তাঁহাদিগের ক্লেশ-স্বীকারই সার।' উপ-সংহারে ব্রহ্মা বলিয়াছেন,—'জীবিত না থাকিলে যেমন দায়ে (পৈত্রিক ধনে) অধিকার থাকে না, সেইরূপ ভক্তের জীবন ভিন্ন মুক্তিরও অন্য অধিকারোপায় নাই।"

* * *

সাধুসঙ্গ।

বুঝিলাম—ভক্তিই মুক্তির প্রশস্ত পথ। কিন্তু ভক্তিও তো বিভ্রান্ত হইতে পারে! এই-খানেই কর্ম্মের কথা উঠে। মানুষ সৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তিমান্ হইতে পারে, আবার অসৎকর্ম্ম করিবার সময়ও ভক্তি-মান্ হইতে পারে। দস্যু দস্যু-বৃত্তি করিতে চলিয়াছে। ভক্তি-ভরে নৃমুণ্ডমালিনীর নিকট সাফল্য-কামনা করিতেছে। সেখানে সে ভক্তিতে কি ফললাভ হইবে, সহজবুদ্ধিতেই উপলব্ধি হয়। আবার আর এক জন, সতী স্ত্রীর সতীধর্ম্ম-রক্ষার জন্য দুর্দ্ধর্ষ-কামুক নরপিশাচের সম্মুখীন হইতেছেন; আর সেই সময় কাতর কণ্ঠে ভগবানের করুণাপ্রার্থী হইয়া ডাকিতেছেন,—'ভগবান! তুমি রক্ষা কর!' এখানে ভক্তির মাহাত্ম্য অন্যরূপ। মানুষ অনেক সময় এই কর্ম্মাকর্ম্ম নির্ণয় করিতে পারে না; তাই বিভ্রমগ্রস্ত হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাই বলিয়াছিলেন,—"কিং কর্ম্ম কিং কর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।' কি কর্ম্ম,

কি অকর্ম্ম,—তাহা নির্ণয় করিতে কবিগণও মুহ্যমান হন; তা অন্যে পরে কা কথা! এ ক্ষেত্রে কি করা প্রয়োজন? শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন,—'সৎসঙ্গ কর।' সৎসঙ্গে সুফল-লাভের দৃষ্টান্তের অবধি নাই। ভগীরথ যখন মর্ত্ত্যে সুরধুনীকে আনয়ন করেন, গঙ্গাদেবী বলিয়াছিলেন,—'আমি পৃথিবীতে যাইতে ইচ্ছা করি না। কারণ, মনুষ্যেরা পাপ-প্রক্ষালন করিবে। কিন্তু আমি সে পাপ কোথায় ক্ষালন করিব?' সে উপায় স্থির না হইলে, দেবী মর্ত্ত্যে আগমনে অসম্মতি জানাইয়া ছিলেন। তাহাতে ভগীরথ সাধু-সঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ব্যপদেশে গঙ্গাদেবীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—

"সাধবো ন্যাসীনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তেহ্যঘভিদ্ধরিঃ॥"

'মাতর্গঙ্গে! সে ভাবনা কি জন্য? আপনি অবহেলায় অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে পারিবেন। কারণ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, সাধুগণ লোকপাবন। তাঁহারা স্ব স্ব অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা আপনার অপবিত্রতা দূর করিবেন। সাধুগণের শরীরে পাপহারী হরি বর্ত্তমান আছেন।' সাধুসঙ্গ-লাভে পাপের ক্ষালন হইয়া পবিত্রতার সঞ্চার হইবে, এই উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়। সাধুসঙ্গের উপযোগিতা সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

"যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা॥

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম॥"

'যেমন ভগবান অগ্নিকে আশ্রয় করিলে, লোকের শীত, অন্ধকার

ও ভয় থাকে না; তেমনি সাধুসঙ্গে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, নৌকা তাঁহাদিগের পরাশ্রয়; সেইরূপ, ঘোর ভবসাগরে নিমজ্জন ও উন্মজ্জনশীল জীবগণের ব্রহ্মজ্ঞ সাধুসকল পরম অবলম্বন।'

* * *

ভক্তির স্বরূপ।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শাস্ত্র নিরস্ত হন নাই। ইহার পর শাস্ত্র ভক্তির স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শাস্ত্রমতে ভক্তি নববিধা। যথা,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

এই নববিধা ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে সমর্পণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার অপেক্ষা শিক্ষা আর নাই। গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'অয়ুষ্মন্ প্রহ্লাদ! এতকাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিক্ষা করিলে, তন্মধ্যে সুশিক্ষিত বিষয় বল,—কিঞ্চিৎ বল!' প্রহ্লাদ তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—'পিতঃ! শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন,—এই নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি অধীত ব্যক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুকে সমর্পণ-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, আমার বোধ হয়, তাহাই উত্তম শিক্ষা।' ভগবন্মহিমা শ্রবণ করিতে করিতে কর্ণ তন্ময় হইয়া যায়, ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে কণ্ঠ তন্ময়ত্ব লাভ করে। এইরূপে প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যখন তাঁহার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, তখন আনন্দের অবধি থাকে না। তখন জলবিন্দুর মহাসাগরে মিলন ঘটে; কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া

বন্ধুর পথে বক্রগতিতে ঘুরিয়া-ফিরিয়া যে স্রোতস্বিনী মরুপথে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, শ্রাবণে প্লাবনে সে আপন গন্তব্য পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে পারে। শাস্ত্র তাই বলিয়াছেন,—'যদি আনন্দ পাইতে চাও, ভগবানে ভক্তিমান হও; যদি ভগবানে ভক্তিমান হইতে চাও, তাঁহার মহিমা শ্রবণ কর —তাঁহার গুণ কীর্ত্তন কর—তাঁহার ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইয়া যাও।' এই সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। ইহারই নাম ভক্তি-সাধনা। এই সাধনার ফলেই মানুষ ধন্য হয়—কৃতার্থ হয়। প্রাণ যাহা চায়, তাহাই পায়। এই সাধনার ভক্তিকল্পতরু-তলে সকল ফলই মিলিয়া থাকে।

স্রষ্টার সন্ধানে।

সন্ধানে।

স্রষ্টার অনুসন্ধানে সৃষ্ট প্রাণী অবিরত ব্যাকুল হইয়া আছে। সংসারে এমন মনুষ্য কেহ নাই—যিনি স্রষ্টার অনুসন্ধানে ভ্রমমাণ নহেন। দেব দ্বিজে ভক্তিমান্ আস্তিক,—তাঁহার ধ্যান-ধারণা জ্ঞান-গবেষণা নিয়ত স্রষ্টার অনুসন্ধানে নিরত রহিয়াছে। আবার যিনি সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দিহান, সেই যে নাস্তিক-চূড়ামণি,—তিনি তো স্রষ্টার অনুসন্ধানেই বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া আছেন! কত জনে কত ভাবে কত রূপে কত দৃষ্টিতেই তাঁহাকে দেখিতেছেন!

* * *

দৃষ্টি।

নানা জনের দৃষ্টি নানা দিকে প্রধাবিত। —জ্ঞানী এক দিকে দেখিতেছেন, অজ্ঞানী আর এক দিকে দেখিতেছেন; পণ্ডিত এক দিকে দেখিতেছেন, মূর্খ আর

এক দিকে দেখিতেছেন; সভ্য এক ভাবে দেখিতেছেন, অসভ্য আর এক ভাবে দেখিতেছেন। কিবা প্রাচীন, কিবা আধুনিক, সকল কালে, সকল দেশে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে, কোন-না-কোনও রূপে স্রষ্টার অনুসন্ধান চলিয়া আসিতেছে। কেবল যে আমাদের দেশের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকারগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে; প্রতীচ্যের প্রাচীন দার্শনিকগণের মুখেও এই উক্তি শুনিতে পাই। গ্রীসদেশীয় প্রাচীন দার্শনিক প্লুটার্ক লিখিয়া গিয়াছেন,—"তোমরা হয় তো এমন রাজ্য অনেক দেখিতে পাইবে,—যে রাজ্যে প্রাচীর নাই, বিধি-বিধান নাই, মুদ্রার প্রচলন নাই, লিপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু এমন মানব কোথাও দেখিতে পাইবে না,—যে মানুষ ঈশ্বরের সন্ধান লয় না, ঈশ্বরের উপাসনা করে না, অথবা ধর্ম্মসংক্রান্ত কোনরূপ ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত নহে।" রোমদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক সিসিরো উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—'মানুষ যতই বর্ব্বর যতই অসভ্য হউক, ঈশ্বর কি—তাহা না বুঝিলেও, তাহারা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে নিরত আছে।'

* * *

রূপ। যিনি যে ভাবে দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছেন, তাঁহার নিকট সেই ভাবেই তিনি প্রতিভাত। কেহ দেখিতেছেন, ঐ প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে তিনি বিদ্যমান্; কেহ দেখিতেছেন, তিনি কল্লোলিনীর ঐ কল-কল্লোলে প্রবহমান্; কেহ দেখিতেছেন, তিনি উচ্চতায় হিমাদ্রি-শিখর; কেহ দেখিতেছেন, তিনি বিশালতায় প্রশান্ত মহাসাগর; কেহ দেখিতেছেন, তিনি ক্ষুদ্রতায় দৃষ্টির অগোচর পরমাণু-কণা;

কেহ আবার, নবীন মেঘের ঢলঢল শ্যামল-মূর্ত্তি দেখিয়া বলিতে-ছেন, তিনি এই 'নব-নীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং'। কত জনে কত ভাবে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত আছেন—তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে, সেই পুরাতন কথাই মনে আসে। সকলের সকল অনুসন্ধান এক সঙ্গে আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়—এই বিরাট্ বিশ্বের সকলই তিনি; মনে হয়,—'অন্ধের হস্তি-দর্শনবৎ' মানুষ যখন তাঁহার যে অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, তখন তাঁহাতে তদ্রূপ রূপ-গুণেরই আরোপ করিয়া লইতেছে। সৃষ্ট প্রাণীর প্রকৃতিভেদে, দৃষ্টির তারতম্যে, স্রষ্টার তাই অনন্ত রূপ। নচেৎ, তিনি যে সেই এক—সেই একই আছেন।

* * *

স্বরূপ-তত্ত্ব।

স্রষ্টার স্বরূপ-তত্ত্ব-নিরূপণে শাস্ত্র তাই কি অনুপম উপমারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'যেমন একমাত্র অগ্নি স্বাভিব্যঞ্জক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত হইয়া উহাদিগের ভেদবশতঃ নানারূপে পরিদৃষ্ট হন, তদ্রূপ একমাত্র-বিশ্বাত্মা পরম পুরুষ (পরমেশ্বর) প্রাণিগণের অন্তরস্থ হইয়া আধারের নানাত্ব-প্রযুক্ত নানা-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।' এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি,—

"যথা হ্যবহিতো বহ্নির্দারুধেকঃ স্বযোনিষু।
নামেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥"

অন্যত্র আবার দেখিতে পাই,—'যেমন মেঘসমূহ আকাশস্থ বলিয়া অনভিজ্ঞ জনগণ মেঘের বর্ণাদি আকাশে আরোপ করিয়া থাকে; এবং পার্থিব রেণুতে-বর্ত্তমান ধূসরতাদি ধর্ম্ম

বায়ুতে আরোপ করিয়া থাকে ; অদৃশ্য আত্মার দৃশ্যত্বও অর্থাৎ শরীরাদিও তদ্রূপ অজ্ঞজনের কল্পনা মাত্র।' শাস্ত্রোক্তি ; যথা—

"যথা নভসি মেঘৌঘো রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥"

অনন্ত।

নাম-রূপ।

শক্তি অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, মহিমা অনন্ত, রূপ অনন্ত, নাম অনন্ত। তিনি এক হইয়াও বহু, বহু হইয়াও এক। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি ব্যক্ত, তিনি অব্যক্ত, তিনি নিরবয়ব, তিনি সাবয়ব, তিনি নিরঞ্জন, তিনি গুণাঞ্জন, তিনি গুণাধার, তিনি নির্গুণাধার, তিনি মূর্ত্ত, তিনি অমূর্ত্ত, তিনি মহামূর্ত্ত, তিনি সূক্ষ্মমূর্ত্ত, তিনি স্ফুট, তিনি অস্ফুট, তিনি করাল-রূপ, তিনি সৌম্য-রূপ, তিনি আত্ম-স্বরূপ, তিনি বিদ্যাবিদ্যালয়, তিনি অচ্যুত, তিনি সদসৎস্বরূপ সদ্ভাব, তিনি সদসদ্ভাবভাবন, তিনি নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাত্মন, তিনি নিষ্প্রপঞ্চ, তিনি জ্ঞানিজনাশ্রিত, তিনি এক, তিনি অনেক, তিনি আদি-কারণ, তিনি বাসুদেব, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি প্রকট, তিনি প্রকাশ, তিনি সর্ব্বভূত অথচ সর্ব্বভূত নহেন, তিনি বিশ্বের হেতুভূত অথচ হেতুভূত নহেন। এই স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়াই ভক্ত-প্রধান প্রহ্লাদ তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন,—

"ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥
গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির।
মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট ॥

করালসৌম্যরূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
সদসদ্রূপসদ্ভাব সদসদ্ভাবভাবন ॥
নিত্যানিত্যপ্রপঞ্চাত্মন্ নিষ্প্রপঞ্চামলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ॥

যঃ স্থূলসূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদ বিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥”

* * *

বর্ণনার অতীত।

বিশেষণে তাঁহাকে বিশেষিত করা যায় না। ভাষায় তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশ করা যায় না। সংসার অনন্ত কাল তাঁহার অনুসন্ধানে ফিরিয়াছে; অনন্ত কাল অনন্ত রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা পাইয়াছে; অনন্ত চেষ্টায় অনন্ত কালেও তাঁহার অনন্তত্ব ধারণা করিতে পারিতেছে না। জন্মের পর জন্ম চলিয়া গেল, কত প্রকার দেহ হইতে কত প্রকার দেহান্তর ঘটিল; কিন্তু তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব অনধিগম্য রহিয়া গেল;—যিনি প্রাণে প্রাণে সে তত্ত্ব অনুভব করিতে পারিলেন, তিনিও তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। সাধক সত্যই বলিয়াছেন,—

“কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ, তোহে সমায়ত, সাগর-লহর-সমানা ॥”

সমুদ্র-তরঙ্গে লহর-মালার ন্যায় সংসার তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই লয়প্রাপ্ত হইতেছে। সেই উৎপত্তি-লয়ের সঙ্গে সঙ্গে কত চতুরানন ব্রহ্মা আবির্ভূত ও তিরোহিত হইলেন, কিন্তু তোমার আদি-অন্ত নির্ণয় করিতে পারিলেন না। স্বয়ং বিধাতাই যখন সে তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তখন তৃণাদপি-

তৃণতুচ্ছ মানুষ তাঁহার কি পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবে? ভক্ত কবি তাই গাহিয়াছেন,—

"কোটী কলপ ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে, তবহুঁ না পাওয়েত পার।
আকাশ পত্র'পরি, সিন্ধুসি পাত্র করি, কলপ কলপ জগজনে জনে লিখ।
এক বরণে তুয়া, জগত ভরল হে, তাক না পাওয়ে দিখ॥

বারিবিন্দু অত, ধরণী-ধূলি যত, কো যদি গণইতে পারে।
সো তব তত্ত্বক, অন্ত না পাওয়ে, সিন্ধু পার—এ অপার॥

অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি, হোয় হোয়ব জন দেখ।
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ, বিশ্ব-বাণী করি এক॥

জগতে যত অন্তর আছয়ে, চিন্তা জ্ঞান করি এক।
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে, হিম-অচলে তৃণ-রেখ॥

অন্ত নাহি তব—অন্ত নাহি তব, অনন্ত দেখ—তু অদেখ।
তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক॥"

'স্বয়ং বিধাতা যদি কোটি কল্প ধরিয়া তোমার মহিমার কীর্ত্তন করেন, তবু তাহার শেষ হয় না। আকাশকে যদি লিখন-পত্র করিয়া লওয়া হয়, মহাসমুদ্রকে যদি কালীর পাত্র করিয়া লওয়া হয়, তোমার নামের একটী বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়; তবুও তাহার পূরণ হয় না। জগতে যত বারিবিন্দু আছে, এই ধরণীতে যত ধূলিকণা আছে, এ সকলের যদি গণনা করা সম্ভব হয়, তবু তোমার অনন্ত তত্ত্বের কিছুতেই অন্ত পাওয়া যায় না। মহাসমুদ্র যদি পার হওয়া সম্ভবপর হয়, কিন্তু তোমার সে অন্ত অপার। জগতে যত লোক জন্মিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যদি অযুত অযুত নয়ন হয়, এবং তাহারা জীবনের আদি-অন্ত ধরিয়া যদি তোমাকে দর্শন করে, তবু তোমার আদি-

অন্ত কেহই দেখিতে পায় না। এই বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্ব-সংসারের সমস্ত প্রাণিকণ্ঠ যদি তাহাতেও তোমার বর্ণনা করে, তবুও তোমার বর্ণনায় কেহ সমর্থ হয় না। এইরূপ, জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলের চিন্তা ও জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তোমার ধ্যান-সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, তবুও তোমার বর্ণনা হয় এইরূপ—যেমন 'হিম অচলে তৃণ-রেখ'; অর্থাৎ, এত করিয়াও হিমাচল-পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র তৃণ-রেখার ন্যায় মাত্র তোমার বর্ণনা করা হয়। অনন্তের যদি অন্ত পাওয়া সম্ভব হয়, তবুও তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি দয়া করিয়া নিজে যদি কাহাকেও জানাইয়া দাও, সেই তোমায় জানিতে পারে।' যে তত্ত্ব এত দুরধিগম্য, তিনি স্বয়ং না জানাইলে যে তত্ত্ব কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই, সে তত্ত্ব কে বিবৃত করিতে পারে?

* *

নামরূপে দ্বন্দ্ব।

সকলই তাঁহার নাম-রূপ। যিনি তাঁহাকে যে নামে ডাকিতে পারেন, যে রূপে দেখিতে পারেন, তিনি সেই নামে সেই রূপে প্রকাশমান্ আছেন। যিনি সর্ব্বময় সর্ব্ব-স্বরূপ, তাঁহার নাম-রূপ-উপাধি লইয়া সংসার বৃথা বিতণ্ডায় কেন আত্মহারা? কেহ বলিতেছেন,—তিনি আছেন; কেহ বলিতেছেন,—তিনি নাই; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ব্রহ্ম; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ব্রহ্মা; কেহ বলিতেছেন,—তিনি গড; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ঈশ্বর; কেহ বলিতেছেন,—তিনি হর্-মজ্দ্; কেহ বলিতেছেন,—তিনি জিহোবা; কেহ বলিতেছেন,—তিনি জিহোবা-এলোহিম; কেহ বলিতেছেন,—তিনি

অগ্নি ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি বায়ু ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি ইন্দ্র ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি কৃষ্ণ ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি খৃষ্ট ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি রাম ; কেহ বলিতেছেন,—তিনি রহিম। তাঁহার নাম-রূপ লইয়া চিরদ্বন্দ্ব চলিয়াছে!

এ সংসারে নাম নিয়ে দ্বন্দ্ব অবিরাম।
কেহ হরি, কেহ কৃষ্ণ, কেহ বলে রাম॥
আল্লা খোদা কেহ কয়, কেহ 'গড' দয়াময়,
যীশু নামে কেহ যাচে ত্রাণ ও বিরাম।
নামে কিবা আসে যায়, বিচারি না দেখে তায়,
কেবা তিনি কিবা রূপ কোথা পরিণাম॥
জল, অম্বু, ওয়াটার, নীর, তোয়, পানি আর,
দেশে-ভেদে ভাষাভেদে ধরে নানা নাম।
নিদারুণ পিপাসায়, বারি বিনা প্রাণ যায়,
জল অম্বু কোনও নামে নাহিক আরাম।
বিনা সেই বস্তু পান—জল যার নাম॥

বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানে অতি অল্প জনেরই মন প্রধাবিত। বাহ্য বিতর্ক লইয়াই সংসার বিব্রত। সংসারে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। সত্য-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছেন। সত্য-তথ্য প্রচারের জন্য সংসারে অসংখ্য অবতারেরও আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, চিরদিনই পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। সকলেই বলিয়াছেন,—সত্য এক ; সকলেই দেখাইয়াছেন,—সত্য অভিন্ন ; সকলেই বলিয়াছেন,—সত্য-প্রচারেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষার ফলে কেন বিরুদ্ধ-মত—কেন বিরুদ্ধ-ভাব প্রচারিত হইল,—ইহাই আশ্চর্য্য! তবে সেই বিরুদ্ধ-ভাবের মধ্যেও যে

একত্ব আছে,—পথ বিভিন্ন হইলেও সেই একের অনুসন্ধানে সকলেই যে ফিরিতেছেন, এবং সেই একেই যে সকলে গিয়া মিলিত হইবার আশা করেন;—বুঝিয়াও, মানুষ সকল সময় তাহা বুঝিতে পারে না,—বিভ্রমগ্রস্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষার ভাব প্রকাশ করে। ইহাই আশ্চর্য্য! পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-সমূহ, ঈশ্বরকে যিনি যে নামেই অভিহিত করুন, যে চক্ষেই দর্শন করুন, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, পরস্পরের মত-বিরোধের মধ্যেও এক অপূর্ব্ব সাম্যভাব পরিলক্ষিত হইবে,—পরস্পরের দ্বন্দ্বের মধ্যেও এক অভিনব অভিন্ন শান্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। সে প্রস্রবণ না দেখিয়া—সে প্রস্রবণে তপ্তপ্রাণ শীতল না করিয়া, মানুষ কেন দিশাহারা হয়?—দিশাহারা হইয়া কেন জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করে? মানুষের বুঝা প্রয়োজন—তাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব; মানুষের বুঝা প্রয়োজন—তাঁহার অনন্তত্ব।

—— * ——

মঙ্গলময়।

প্রার্থনা।

মঙ্গলময়!—মঙ্গল বিধান কর। বিঘ্ন-বিনাশন!—বিঘ্ন দূর কর। শক্তিময়!—শক্তি-সামর্থ্য দেও। স্মৃতি-ধৃতি-জ্ঞান-বুদ্ধি-সর্ব্বমূলাধার তুমি—বিভ্রম বিদূরণ কর।

* * *

কেন ভুলি?

কেন ভুলে যাই? কেন বিশ্বাসহারা হই? কেন নির্ভরতায় সংশয় আসে? শয়তান!—তুই সম্মুখ হইতে দূর হ'! এমন উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, এমন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, এমন বিশ্ব-প্রভ সূর্য্য—সংশয়ের কুয়াসায় অবিশ্বাসের মেঘে

কেন ঢাকিয়া ফেলিস্? তুই না এমন করিলে, ধর্ম্মবিশ্বাসহীন নির্ভরতা-হারা না হইলে, মানুষ এমন হাবুডুবু খাইবে কেন?

* * *

প্রত্যক্ষ-দর্শন।

প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি—বিশ্বাস কর আর নাই কর—নির্ভরতার কি মহিমা! বিপত্তির বিশাল পারাবারে নৈরাশের ঘোর অন্ধকার; কাঁদিতে কাঁদিতে কাতর-কণ্ঠে ডাকিয়াছি—"দীননাথ! রক্ষা কর।" অমনি তিনি, পিতার দয়ায়—মাতার মমতায়, সান্ত্বনার স্নেহ-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন,—প্রাণ পুলক-প্রফুল্ল হইয়াছে। শয়তান!—তুই আবার কেন এলি?—আবার কেন বিস্মৃতির ব্যবধান বিস্তার করিলি?—আবার কেন তাঁহাকে ভুলিয়া গেলাম?—আবার কেন নরকে ডুবিলাম?

* * *

আবার।

এ জাতি শান্তির পথ বহুদূরে ফেলিয়া আসিয়াছে। এ জাতির উন্নতির সোপান ভগ্ন ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যেদিন হইতে ধর্ম্মবিশ্বাস কমিতে আরম্ভ হইয়াছে, যেদিন হইতে ঈশ্বরে নির্ভরতা-হারাইতে বসিয়াছে, সেই দিন হইতে পথ পিছাইয়া পড়িয়াছে—সোপান ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিবা ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, কিবা সুখশান্তি—এ জাতির এখন আর আপনার বলিবার কিছুই নাই! তবে হয়—আবার হয়—আবার যদি আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও ঈশ্বর-নির্ভরতা ফিরিয়া পায়—আবার যদি আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইতে পারি। ডাকিতে জানিলে, নিশ্চয়ই তিনি শুনিতে পান! কাঁদিয়া ডাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যক্ষীভূত হন!

———*———

প্রভুর অনুসরণ।

একই ভাবনা।

একই কথা, একই চিন্তা, একই আলোচনা—আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে! আবার একই সংশয় আবহমান কাল মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আবহমান কাল মানুষ সুখ অন্বেষণ করিতেছে। আবহমান কাল মানুষ চরম-সুখ-লাভের পন্থাসমূহ অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছে। আবহমান কাল সুখের স্বরূপ-তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে। আবহমান কাল চরম-সুখলাভের উপায়-পরম্পরা সম্মুখে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। আবহমান কাল ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি রোধ করিতেছে। আবহমান কাল বিভ্রমগ্রস্ত থাকিয়া মানুষ অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

* * *

কর্ম্ম-প্রসঙ্গ।

পুরাতন—অতি-পুরাতন, সেই একই কথা—একই তত্ত্ব, শাস্ত্রকারগণ বুঝাইয়া গিয়াছেন। ধার্ম্মিকগণ—পণ্ডিতগণ, সেই একই কথা—একই তত্ত্ব, বিবৃত করিতেছেন। অথচ, সেই একই ভ্রান্তি—একই কুসংস্কার—হৃদয়ে বদ্ধমূল রহিয়াছে! দৃষ্টান্ত কত উল্লেখ করিব! শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'কর্ম্ম দ্বারা সুখসাধন বা মোক্ষলাভ হয়।' কর্ম্মের স্বরূপ-তত্ত্ব বুঝাইতেও শাস্ত্রকারগণ ত্রুটি করেন নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, যে কর্ম্মে ভগবানের তুষ্টিবিধান হয়; "তৎকর্ম্মং হরিতোষং যৎ।" শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'সেই ভগবানকে পায়, যে ভগবানের কর্ম্ম করে। যাহার সকল কর্ম্ম ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেই ভগবানকে লাভ করিয়া থাকে।' শ্রীমদ্ভগব-

গীতায় ভগবদুক্তিতে প্রকাশ,—"যৎকরোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥" 'হে কৌন্তেয়! যে কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যে কোনও দ্রব্য ভোজন কর, যাহা হোম কর, সে সকলই আমাতে অর্পণ করিবে।' ইহার পর শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—'উল্লিখিত প্রণালীতে কর্ম্মত্যাগ করিলে শুভাশুভ ফলাসক্তি হইতে ও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে। এইরূপে মুক্ত হইলে কর্ম্মত্যাগ-রূপ যোগ-যুক্ত হইয়া তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।'

* * *

মুক্তি।

এই স্থলে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে। কেহ বলেন,—'ভগবানে আরোপিত কর্ম্মই ভক্তি। ভক্তি দ্বারাই মুক্তি হয়।' ভক্তিতত্ত্বজ্ঞগণ সেই ভক্তিকে আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি বলিয়া আখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—'কর্ম্ম স্বয়ং ভক্তি না হইতে পারে; কিন্তু ভগবানের সহিত সংস্রবযুক্ত হইলে তাহা ভক্তিরূপেই পরিণত হইয়া থাকে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা উল্লেখ করেন,—'সূর্য্যকান্ত মণির স্বতঃসিদ্ধ দাহিকা-শক্তি নাই সত্য; কিন্তু সূর্য্যরশ্মিসম্বন্ধ লাভ করিলে তাহাতে দাহিকা-শক্তি হইয়া থাকে; সূর্য্যের শক্তিতে সে শক্তিসম্পন্ন হয়।' কেহ আবার বলেন,—'ভগবানে আরোপিত কর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞান-সাহায্যে কর্ম্মের ঔচিত্যানৌচিত্য নিরূপণ প্রসঙ্গই এ ক্ষেত্রে উপলব্ধি হয়।' অর্থাৎ,—যিনি সৎস্বরূপ, সৎ-কর্ম্মেই তাঁহার কর্ম্ম, সৎকর্ম্মেই তাঁহার প্রীতি। ইহসংসারে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, যে প্রভু জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়তা ও সত্যপ্রিয়তা

তাঁহার ভৃত্যের প্রতিষ্ঠামূলক; সে প্রভু সেইরূপ ভৃত্যই অনুসন্ধান করেন। আবার যে প্রভু কুকর্ম্মী কদাচারী, সে প্রভু সেইরূপ কুকর্ম্মপরায়ণ কদাচারী ভৃত্যই অনুসন্ধান করিয়া লন। অর্থাৎ,—প্রভু যেরূপ, তাঁহার ভৃত্যও প্রায় সেইরূপ হয়। প্রভুর প্রিয় হইতে হইলে প্রভুর গুণের অনুসরণ করাই শ্রেয় ও বিধেয়। প্রভুর তাহাতেই প্রীতি।

* * *

অভিন্নত্ব।

[illegible]তে দেখিলে দুইয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। ভক্ত আপন আরাধ্য দেবতাকে যেরূপ রূপ-গুণে বিভূষিত করিবেন, তাঁহার কর্ম্ম-পরম্পরাও তদ্রূপ হইবে। ভক্ত যদি বুঝিতে পারেন, তাঁহার আরাধ্য দেবতা ন্যায়স্বরূপ সত্যস্বরূপ শান্তিস্বরূপ, তখন তিনি আপন দেবতার পরিতুষ্টির জন্য ন্যায়পরায়ণতা অভ্যাস করিবেন, সত্যপরায়ণ হইতে শিখিবেন, সংসারে শান্তির প্রবাহ প্রবাহিত করিতে চেষ্টান্বিত হইবেন। তাহাই তাঁহার ভক্তি,—তাহাই তাঁহার জ্ঞান। কর্ম্মক্ষেত্র সংসারে সেই জ্ঞান সেই ভক্তি লইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই ভগবানের পরিতোষ-বিধানে সমর্থ হন, তিনিই কর্ম্ম দ্বারা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারেন। সংসারে সকলেই আপন আপন দেবতাকে গুণের আকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সংসারী কেহ কখনও আপন ইষ্ট-দেবতায় পাপের আরোপ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই; কোন্ কর্ম্ম কর্ম্ম, আর কোন্ কর্ম্ম অকর্ম্ম,—তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, হয় তো সময় সময় অনেকে আপন আপন দেবতার নামে পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে

পারে। কিন্তু দেবতাকে সে কথনই পাপের আধার বলিয়া মনে করে না। সাধারণতঃ সকলেই আপন দেবতাকে অপরূপ রূপগুণসম্পন্ন বলিয়াই মনে করে।

* * *

সুখ সোপান।

মানুষ যদি তাই মনে করে, আপন দেবতাকে অনন্ত-গুণের আকর বলিয়া যদি তাহার ধারণা হয়; আর যদি মানুষ জানিতে পারে,—তাঁহার পরিতোষ-সাধনোদ্দেশ্যে নিয়োজিত যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মফলেই মুক্তিলাভ হয়; তাহা হইলে মানুষের অনেক সংশয় বিদূরিত হইতে পারে, সুখের অন্বেষণে বিভ্রান্ত হইয়া বিপথে ভ্রমণ অনেক পরমাণে কমিয়া আসে। সুখান্বেষণে বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইলে কি হইবে? আগে আপন আরাধ্য দেবতার অনুসন্ধান কর। তিনি কত গুণে গুণান্বিত, তিনি কত গুণের আকর,—বেশ করিয়া বুঝিয়া লও। তার পর, তাঁহার পরিতোষ-সাধনে প্রবৃত্ত হও। তাঁহাকে সত্যস্বরূপ বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে সত্যের সমাদর করিতে শিখ। তাঁহাকে ন্যায়স্বরূপ বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়পরায়ণ হইতে অভ্যস্ত হও। তাঁহাকে করুণার সাগর বলিয়া মনে কর; সঙ্গে সঙ্গে করুণা-বিতরণে দীক্ষা লও। তাঁহার যত গুণ, তোমাতেও যেন সেই সকল গুণের বিকাশ পায়। তাহা হইলেই তাঁহার পরিতোষ ঘটিবে। তাহা হইলেই তুমি সুখী হইতে পারিবে; সুখী হইতে হইতে ক্রমে চরম-সুখ মুক্তি লাভ করিবে।

প্রণতি।

হে ওম্! হে অনন্ত! হে ভর্গ! হে বরেণ্য! হে সত্য! হে সনাতন! হে পূর্ণ! হে পর! হে নিত্য! হে নিরঞ্জন! হে ঈশ! হে ব্রহ্ম! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে সর্ব্ব! হে সর্ব্বময়! হে সর্ব্বব্যাপিন্! হে সর্ব্বসান্নিধ্যভূত! তুমি জলস্থলমরুদ্ব্যোম সর্ব্বত্র, ওতঃপ্রোতভাবে, তুমি অন্তরে ও বাহিরে, সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে, ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে, বিরাজ করিতেছ। হে বিভো! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে আদি! হে অনাদি! হে নিত্যসত্য! হে কালরূপ! হে সর্ব্বকালবিদ্যমান! তুমি আদিতে ও অন্তে, সৃষ্টিতে ও প্রলয়ে, ভূতে ও ভবিষ্যতে, জন্মে ও মরণে, বিচ্ছেদে ও মিলনে, সর্ব্বকালে বিরাজমান। যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব মাত্র ছিল না; যখন জলে ও স্থলে, পর্ব্বতে ও সাগরে, আঁধারে ও আলোকে, সর্ব্বত্র অভেদ-একাকার ভাব; তখন কেবল তুমিই—তোমার সেই মহামহিমময় তোমাতেই—বিরাজমান ছিলে। হে প্রভো! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে জন্ম! হে বিলয়! হে জনক! হে সংহারক! হে জন্ম-জন্মান্তকারিণ! হে সংযোগবিলয়নিদান! তুমিই পিতা, তুমিই সংহর্ত্তা; তুমিই জননী, তুমিই সংহারিণী; তুমিই উৎপত্তি, তুমিই বিলয়; তুমিই সংযোগ, তুমিই বিয়োগ; তুমিই প্রাণ, তুমিই প্রাণান্তকারী; তুমিই জীবন, তুমিই জীবনাপহারী; তুমিই জন্ম, তুমিই মৃত্যু; তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মহেশ্বর; এ সংসার তোমাতেই উদ্ভূত

হইয়াছে, আবার তোমাতেই বিলীন হইতে চলিয়াছে। হে ঈশ! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।

হে শান্তি! হে শান্তিময়! হে দয়িত! হে দয়াময়! হে দীন-তারণ! হে পতিতপাবন! হে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু! হে নরকান্তকারি! হে সর্ব্বশক্তিমান্! হে সর্ব্বগুণাধার! তুমি রোগে ও শোকে, সুখে ও দুঃখে, বিপদে ও সম্পদে, সংসারে ও অরণ্যে, জরায় ও যন্ত্রণায়, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়—কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি প্রবল, কি দুর্ব্বল, কি সিংহ, কি শৃগাল—সর্ব্বলোকে, সর্ব্ব-কালে, সম-নির্ব্বিশেষে, তোমার সেই অপার অনন্ত করুণাসাগরের সুশীতল অমৃতবারি পান করিতে দাও। মঙ্গলময়! হে শান্তিনিলয়! তুমি এ অধম অকৃতিসন্তানের মঙ্গলবিধান কর। তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার।